দেশ-দেশান্তরের কবিতা

অনুবাদ

বুদ্ধদেব বসু



বিকল্প প্রকাশনী ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

DESH-DESHANTARER KABITA
[Poetry from different lands,
translated into Bengali by
BUDDHADEVA BOSE, a major
poet of the 20th Century Bengal]
Published by Vikalp

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা :
দময়ন্তী বসু সিং

প্রকাশক :
দময়ন্তী বসু সিং
বিকল্প প্রকাশনী
১ বিধান সরণি. তিনতলা
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক :
ক্রিয়েশন
২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা-৭০০০১৪

ভূমিকা

বুদ্ধদেব বসুর প্রধান অনুবাদকর্মগুলি—বোদলেয়ার, রিলকে, হ্যেল্ডার্লিন ও কালিদাসের *মেঘদূত*—কবি স্বহস্তেই তৈরি করে দিয়ে গেছেন অসামান্য ভূমিকা-টীকা সম্বলিত এক একটি পূর্ণ গ্রন্থ হিশেবে। এর বাইরে একটি বড় কাজ বরিস পাস্টেরনাকের জ়িভাগোর কবিতা গুচ্ছের অনুবাদ, সঙ্গত কারণেই, *ডাক্তার জ়িভাগো* উপন্যাসের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন। এ ছাড়া, ছোট ছোট গুচ্ছে, অথবা এককভাবে, তিনি বিভিন্ন দেশের কবিতার যে সমস্ত অনুবাদ নানা সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তার কিছু কিছু অংশ বৃহত্তর সংগ্রহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : বুদ্ধদেব বসুর *কবিতা সংগ্রহ*, ৫ ও *রচনা সংগ্রহ*, ৩ এবং ৮)। কিন্তু লক্ষ না করে পারিনি, বহু পাঠকের কাছেই এই বিচ্ছিন্ন কবিতাগুলি হারিয়ে আছে, মূলত, একটি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়নি বলেই। বড় সংগ্রহ কেনা ব্যয়সাপেক্ষও বটে। আর রচনা সংগ্রহ তো অলভ্য আজ বহুদিন।

সেই কারণেই, অগ্রন্থিত সহ, সমস্ত ছড়ানো-ছিটোনো কবিতা একসঙ্গে করে একটি ছোট আকারের অনুবাদ-কবিতা সঙ্কলনের প্রয়োজন আছে মনে হয়েছিলো। বিশেষ করে সেই সব অনতিসম্পন্ন সাহিত্যানুরাগী কবিতা-পাগল ও বুদ্ধদেব বসুর কাব্যানুবাদের দ্বারা স্পৃষ্ট পাঠকগোষ্ঠীর জন্য যাঁরা কবিতার বই ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখতে ভালোবাসেন।

এই সঙ্কলনে সমাবেশিত হলো বুদ্ধদেব বসুর বিভিন্ন বয়সে অনূদিত দেশ-দেশান্তরের কবিতা। এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হবে বহির্বিশ্বের কবিতার প্রতি কবির আকৈশোর অনুরাগ ও অনুবাদের প্রতি আগ্রহের এক আবহমান ইতিহাস। কবিতা সাজানোর ব্যাপারে আমরা নতুন থেকে পুরোনোয় ফিরেছি, কিন্তু একই দেশের কবিতার ক্ষেত্রে নতুন-পুরোনো একত্র রাখা হয়েছে, পাশাপাশি। প্রকাশকাল অনুধাবন করলে দেখা যায় সেই 'প্রগতি' 'কল্লোল'-এর সময় থেকেই বুদ্ধদেব য়োরোপীয় কবিতা বাঙালি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। নিজেই শুধু অনুবাদ করেননি, কবি বন্ধুদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন য়োরোপীয় কবিতার অনুবাদে, সেই 'প্রগতি'র কাল থেকেই। চীনে-জাপানি কবিতাও বাদ যায়নি। তাঁর করা চীনে কবিতার অনুবাদ রসালো ফলের মতো স্বাদু। এমন কি খলিল জিব্রান! এই নামটি পর্যন্ত যখন কেউ শোনেননি, তিনি সেই আধা-মফস্বল ঢাকা শহরে বসেই আবিষ্কার করেছিলেন সেই মহৎ আরবী কবিকে, ১৯২৫-এ। তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ তৈরি করতে গিয়ে তিনি রিলকে, বোদলেয়ার, মালার্মে, হ্যেল্ডার্লিনকে চেনেননি, এঁদের চিনতেন বলেই তুলনামূলক সাহিত্যের যাথার্থ্য অতি স্বাভাবিকভাবে তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়েছিলো। শিল্পীর স্বাধীনতায় আমৃত্যু বিশ্বাসী বুদ্ধদেব বসু গভীর একাত্মতা অনুভব করেছিলেন পাস্টেরনাকের সঙ্গে—জ়িভাগোর সব

ক'টি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন এক বেদনাপ্লুত সহমর্মিতায়। মার্কিন অথবা ইংরেজ কবিদের অনুবাদ করতে যেন ততোটা আগ্রহী ছিলেন না। লরেন্সের একাধিক কবিতা অনুবাদ করেছিলেন বলে আমাদের ধারণা, কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেলো মাত্র একটি। পাঠকের কাছে যদি অন্য কোন বিচ্ছিন্ন অনুবাদের খোঁজ থাকে, আমাদের জানালে বিশেষ বাধিত হবো।

এক সত্য এবং গভীর, সহজ এবং সংকেতময়, আত্মিক সংযোগ ঘটেছিলো তাঁর কোনো কোনো য়োরোপীয় কবির সঙ্গে—যার শেষ উদাহরণ ডাগ হামারশ্যেল্ডের কবিতাগুচ্ছ। সুইডিশে তিনি কেমন লিখেছিলেন আমি জানি না, কিন্তু আজও পর্যন্ত অগ্রন্থিত, ১৯৬৫-তে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, বুদ্ধদেব বসু অনূদিত হামারশ্যেল্ডের ন'টি কবিতা বাংলায় পড়া আমার জন্য এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। না ভেবে পারি না, সত্যিই কি হামারশ্যেল্ড এতো মহৎ কবি, না কি বুদ্ধদেব বসুর ভাষান্তর তাঁকে সেই উচ্চ মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে? কই, ইংরিজি অনুবাদে তাঁর কবিতা পড়ে তো এভাবে স্পৃষ্ট হইনি?

আমি হইনি, কিন্তু তিনি হয়েছিলেন। স্পৃষ্ট, রোমাঞ্চিত। কারণ তিনি ছিলেন শিরায়-উপশিরায় সৃষ্টিশীল কবি। তাঁর তন্ত্রীতে কবিতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা যে অনুরণন তুলতো তা ভাষানির্ভর ততোটা নয়, যতোটা বোধ-নির্ভর। অবয়বে নয়, অনুভবে পেতেন তিনি কবিতাকে, কবিতার আত্মায় যাদুকরের মতো প্রবেশ করতেন সরাসরি। ভাষান্তর নয়, তিনি অন্য ভাষার কবিতাকে নিজস্ব সৃষ্টিকর্মে রূপান্তরিত করেছেন অবিরত, মৌলসৃষ্টির আহ্লাদ এবং আস্বাদ অনায়াসে জড়িয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে, স্থাপন করেছেন বাংলাসাহিত্যে অনুবাদ-কবিতার এক মহৎ ধারা। কবির ৯১তম জন্মদিনে 'বিকল্পে'র নিবেদন এই সঙ্কলনটি গুণগ্রাহী পাঠকের কাছে আদৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

এ বই-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভুলভ্রান্তি নিশ্চয়ই থেকে গেছে। পাঠক নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন। মুদ্রক যে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি তা আমি জানি। প্রকাশনার কাজে আমার সহায়ক-সহকর্মী শৌনকের নিরলস ও উদ্দীপক সাহায্য ছাড়া এই সঙ্কলন এতো দ্রুত সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিলো। তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

দময়ন্তী বসু সিং

সূচীপত্র

শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' অবলম্বনে

স্তোত্র

সমুদ্রের মতো ছড়িয়ে আছে আনন্দ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে :
মধ্যখানে সেই মণিদ্বীপ, সেই চিন্তনীয় মন্দির,
যেখানে দেবগণ হন আনত, তোমার পায়ের তলায় ধাপে-ধাপে সোপান,
যখন তুমি আরোহণ করো, মোহিনী, তোমার তুঙ্গ, মহান কামনার পর্যঙ্কে।

বীণা বাজে কাননে, ফুলেরা নেয় মোহন তানে নিশ্বাস,
বন্দনা করে বিহঙ্গম, আর পতঙ্গ, আর ব্যাঘ্র,
বাইরে প'ড়ে থাকে সময়, সেবকের মতো অপেক্ষমাণ—
যখন তুমি আরোহণ করো, মোহিনী, তোমার তুঙ্গ, মহান কামনার পর্যঙ্কে।

রাত্রির মতো বিশাল তোমার কেশদাম, মাথায় জ্বলে নক্ষত্রের মুকুট,
তোমার এক হাতে বীজমন্ত্রমালা, অন্য হাতে চিরন্তন পুস্তক ;
যেহেতু তোমার ছায়া পড়ে চিন্তায়, কিংবা কোনো মুহূর্তের স্বপ্নে,
তাই শব্দ হ'য়ে ওঠে কবিতা, দ্রবময়ী দ্রাক্ষার মতো হার্দ্য।

শুনেছি কন্দর্পের কাহিনী, মর্মভেদী যাঁর পুষ্পবাণ,
বসন্ত যাঁর সামন্ত, নিঃশ্বাসন বাসনাই সারথি ;
কিন্তু এই বিশ্বজয়ী বীর,—তারও, জানি, প্রেরণার উৎস
তোমারই অপাঙ্গ থেকে ছিন্ন এক কণা দৃষ্টির করুণা।

দেখেছি অতি কদর্য এক বৃদ্ধকে, রাক্ষসী জরা আর ভার্যা ;
কিন্তু, জানি, ছুটবে তারও পিছনে কান্তিময়ী যুবতীরা, উদ্দাম,
উন্মোচিত স্তনে তুলে কাঁপন, পরিশ্রমে, মদস্রাবে বিলোল—
যদি সে পায় এক কণা দৃষ্টি, তোমার অপাঙ্গ থেকে মুক্ত।

চিরতরুণ শৃঙ্গারে তোলো তরঙ্গ—রতিদাত্রী, সরস্বতী তুমি!
মাঝে-মাঝে মর্ত্যে ঝরে বিন্দু, ছড়িয়ে যায় রশ্মিরেখা এঁকে—
আর তখনই কোনো ভাষা পায় ছন্দ, কিংবা কোনো ভাবনা হয় প্রতিমা,
আলিঙ্গনে মৃত্যুভয় ভোলে হন্তার জন্মদাতা দম্পতি।

অন্য সব দৃশ্য মুছে দিয়ে, হৃদয়ে যারা দ্যাখে তোমার নয়ন,
রোপণ করে সংগোপনে তোমাকে, জ্যোতির্বীজ—অনিশ্চিত অমায় :
শুনেছি তুমি দাও তাদের দান—খেলাচ্ছলে, সকৌতুকে তাকিয়ে—
সব সোনা, সব চন্দনের বন, আর সঙ্গে দাও উর্বশীকে যৌতুক।

কিন্তু উর্বশী—চিরকাল ঊর্ধ্বমুখ যার স্তনাগ্র
রোমকূপ বিদ্যুৎগর্ভ, নিষ্ঠীবন ইন্দ্রপেয় সোম,
যে সরিয়ে দেয় রতিক্লান্ত তপস্বীদের, অঙ্গ থেকে, কাঁচুলির মতো নির্ভার,
অলজ্জিতা, আহ্লাদিনী, নগ্না : সে-ই বা তোমার তুলনা—কী?

ঈশ্বরী তুমি, ইতিহাসের অতীত—তুমি কেন্দ্র, প্রান্ত, অন্তরাল ;
বিশ্ব তোমার শরীর, সূর্য আর চন্দ্র তোমার স্তনযুগ,
তাদের মণ্ডলে আবৃত্ত হয় ঋতুরা, ভেদচিহ্নে ইঙ্গিত আঁকে অদৃষ্ট ;
তোমার নাভিরন্ধ্রে একত্রে থাকে লুকিয়ে, আমরা যার নাম দিয়েছি ত্রিকাল।

ব্যোম তুমি, মন তুমি, তুমি জল, আর জলের তরলতা,
পঞ্চভূত বাঁধা পড়ে স্তবকে, বন্ধু হয় চেতনা আর ইন্দ্রিয়,
যত দ্বন্দ্ব, যত বিবাদ, যত ছিন্নভিন্ন আপাতিক অংশ—
সব, সব মিলে যায়, দেবী, তোমারই স্থির, অবিকল আনন্দে ;

কিন্তু আমি দরিদ্র, বিচ্ছেদে আমার নিবাস,
আমি তোমাকে দেখতে পাই না, দেখা পেলেও সহ্য হবে না, জানি ;
আমি শুধু খুঁজি তোমার আভাস, কোনো সংকেত, কোনো স্বপ্নের মুহূর্ত ;-
তারই জন্য আমি সচেষ্ট, স্বপ্নেয়মান :

সেই সব মুহূর্ত, যখন হৃদয়ে শুনি শব্দের পদপাত,
ভাষা ধরা দেয় ছন্দে, মনন হ'য়ে ওঠে মূর্তি,
যখন আমার সংশয়, আমার আর্তি, আমার বিকার, আমার শূন্যতা—
সব, সব সার্থকতা পায় এক উপার্জিত, ভঙ্গুর আনন্দে।

বিশ্ব অতি বিশাল, আমি ক্ষুদ্র। কিন্তু আমিও
পারি মৃত্যুভয় ভুলে মুহূর্তের জন্য প্রেমিক হ'তে,
বৃদ্ধা বাক্ যখন ফিরে পায় যৌবন, তোমার এক কণা শৃঙ্গার করুণায়—
তুমি, কামেশ্বরী, সরস্বতী, আমার আরাধ্যা!

ডাগ হামারশ্যেল্ডের কবিতা

অন্য এক সত্তা ছিলো তাঁর। কবি, মরমী, ভাবুক, ঈশ্বরের জন্য সতৃষ্ণ। জটিল চঞ্চল বিক্ষুব্ধ জগতের কেন্দ্রবাসী এক নিঃসঙ্গ মানুষ। সাহিত্যিক অর্থে কবি নন, আনুষ্ঠানিক অর্থে ধার্মিক নন, খাঁটি মরমীদের অর্থে সাধকও তাঁকে বলা যায় না। অথচ এই সব দিকেই উন্মুখতা ছিলো তাঁর, তাঁর বহুমুখী-ক্ষমতাশালী মন গোপনে যে স্থৈর্যের জন্যে প্রার্থনা করেছে, সেটা এই সংসারে শুধু তাঁদেরই লভ্য, যাঁরা ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। তাই, যদিও তাঁর জীবন ছিলো জগতের কাছে উৎসর্গিত, যদিও তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য তাঁকে ইতিহাসের তরঙ্গ-চূড়ায় তুলে ধরেছিলো, তবু সেই সুদূরের প্রান্তে মনের একটি অংশকে বরাবর সংলগ্ন রেখেছিলেন এই তীক্ষ্ণ ধনবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক, জীবনের শেষ নয় বৎসর ধরে যিনি ছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান কর্মসচিব, জগৎবিখ্যাত ডাগ হামারশ্যেল্ড। সম্প্রতি তাঁর ডায়েরি প্রকাশিত হবার ফলে এই তথ্যটি আমরা জানতে পেরেছি।

এই ডায়েরির সঙ্গে (সুইডিশ শিরোনামা : 'পথচিহ্ন', ইংরেজিতে 'মার্কিংস' নামে বেরিয়েছে) ডায়েরি বিষয়ে প্রচলিত কোনো ধারণাকে মেলানো যায় না। বইটি একেবারে নিরঞ্জনরূপে তথ্যহীন। যে-সব বিরাট আন্তর্জাতিক ঘটনায় তিনি লিপ্ত ছিলেন তার তিলতম উল্লেখ নেই কোথাও, তিলতম উল্লেখ নেই তাঁর সেই জীবনের, আমরা সাধারণত যাকে ব্যক্তিগত বলি—তিনি বিবাহিত ছিলেন কিনা, এ-বই পড়ে তা সুদ্ধ জানা যাবে না। গদ্য, কখনো পদ্য, কখনো সূত্রের মতো ক্ষুদ্র ও সংহত, মাঝে মাঝে দীর্ঘতর অনুচ্ছেদ, দুটি-একটি গদ্য কবিতা, কয়েকবার জাপানি ধরনে হাইকুর পর্যায়—এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে আমরা যাঁকে দেখতে পাই তিনি আধ্যাত্মিক সংগ্রামে লিপ্ত একজন আর্ত ও ব্যাকুল মানুষ। অর্থাৎ, রচনাগুলি গভীরতম অর্থে ব্যক্তিগত ; সবই তাঁর নিজের সঙ্গে সংলাপ (তাঁর নিজের ভাষায় 'বোঝাপড়া') —আত্মপরীক্ষা, আত্মসন্ধান—অথবা ভগবানের উদ্দেশে এক দীর্ঘ স্বগতোক্তি। ভাবতে অবাক লাগে যে, যে-সময়ে তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের সচিবরূপে দৈনিক কুড়ি ঘণ্টা করে খাটছেন, ভ্রমণ করছেন নানা দেশে, কোটি-কোটি ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত সমস্যায় যখন তাঁর দিনরাত্রি রুদ্ধশ্বাস, তখনও এই গোপন পুঁথিতে অক্ষর বসাতে পেরেছিলেন, এই তাঁর 'অন্য' জীবন থেকে কখনো দূরে সরে যাননি। তবে কি তিনি কর্মী ও ধ্যানীকে মেলাতে পেরেছিলেন নিজের জীবনে? ঠিক তা নয়, আধুনিক যুগে তা সম্ভবপরতার পরপারে। ইতিহাস, সন্দেহ নেই, কর্মী হামারশ্যেল্ডকেই মনে রাখবে। তবু তাঁর কর্মজীবন ও নিভৃত ধ্যান পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয় ; তিনি, অনমনীয় আদর্শবাদী, মানুষের মঙ্গলে বিশ্বাসী ও তার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট—তিনি চেয়েছিলেন

নিজেকে এই মহৎ কর্মের যোগ্য করে তুলতে, তাঁর আধ্যাত্মিক প্রয়াসের অর্থ হ'লো এই। কিংবা তাঁর আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষাই কর্মের আকারে প্রকাশিত হয়েছিলো, সেটাই ছিলো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ তিনি ছিলেন গীতার ভাষায় কর্মযোগী—শুধু কর্মবীর নন; ইতিহাসের পুত্তলি ব'লে তিনি ভাবেননি নিজেকে, চেয়েছিলেন কোনো ধ্রুব ভিত্তির উপর তাঁর কর্মের প্রতিষ্ঠা হোক। এত বড়ো উচ্চাশা অমার্জনীয় হ'তো যদি না সেই সঙ্গে থাকতো ত্যাগের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ। যৌবনের একটি কবিতায় যে সরল আত্মাহুতির কথা তিনি বলেছিলেন তার জন্য আকাঙ্ক্ষা, মনে হয়, তাঁর কখনো মেটেনি—না কি মিটেছিলো সেই মুহূর্তে, যখন অকস্মাৎ রোডেশিয়ার আকাশে বিদীর্ণ হয়েছিলো তাঁর বিমান?

যদি আমরা তথ্য হিশেবে নাও জানতুম যে হামারশ্যেল্ড ছিলেন বহু ভাষাবিদ পঠনশীল বিদগ্ধ মানুষ, সিনজিন পের্স ও জুয়ানা বার্নস-এর সুইডিশ অনুবাদ করেছিলেন, যদি এই পুস্তকে—শুধু বাইবেল ও য়োরোপীয় মিস্টিকদের রচনা নয়—জালালুদ্দীন রুমি, জরথুস্ত্রীয় শাস্ত্র, ককতো, ফকনার, ইবসেন, হ্যেল্ডারর্লিন, টমাস ব্রাউন প্রভৃতির উল্লেখ ও উদ্ধৃতি না-থাকতো, তাহ'লেও দু-চার পৃষ্ঠা পড়েই আমরা বুঝে নিতে পারতুম যে, এই লেখক বিশ্বসাহিত্যে স্নাত, এবং কবিতার প্রেমিক। যেন নানা চেনা মুখ উঁকি দেয় তাঁর লেখার পিছনে—রিলকে, কাফকা, কাম্যু, জাপানি চিত্রকবিরা, কোনো-এক মুহূর্তে হিন্দু দর্শন। বোঝা যায়, তিনি আধ্যাত্মিকভাবেও বিশ শতকের মানুষ—যা রাজনীতির পক্ষে প্রায় বিপজ্জনক—তাঁর 'বিশ্বাস' তাঁর সংশয়কে আহার করেই পুষ্ট হয়েছে। ১৯৫২ সালে তিনি লিখেছিলেন :

> 'আমি যা চাই তা অসম্ভব। আমি চাই জীবনের
> অর্থ থাকবে।... চাই, আমার জীবন
> একটি অর্থ খুঁজে পাবে।'
> ' "একটি অর্থ।" সতেরো বছরের বালকের
> মুখে এই কথাটা হাস্যকর, কেননা সে
> কী বলছে তা সে জানে না। এখন
> সাতচল্লিশ বছর বয়সে, আমি তেমনি
> হাস্যকর, কেননা কাগজের উপর কী-কথা
> লিখছি তা অভ্রান্তভাবে জেনেও তা না-লিখে
> পারছি না।'

জীবনের অর্থ খোঁজাটা ধৃষ্টতা, অথচ সেই সন্ধানেই মানুষের মনুষ্যত্ব, এ-কথা যিনি বুঝেছিলেন তিনি বেদনার সূত্রে আমাদের আত্মীয় তাতে সন্দেহ নেই।

হামারশ্যেল্ডের কবিতা কত ভালো, তার চেয়েও আকর্ষণযোগ্য প্রশ্ন হলো : কবিতা তিনি কেন লিখেছিলেন? তাঁর গদ্যও সাংকেতিক, এবং নিজের সঙ্গে বোঝাপড়ার পক্ষে গদ্যই হ'লো যোগ্যতর বাহন। এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হ'লো —আর এটা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য

নয়—যে তাঁর হাতে ছন্দোবদ্ধ রচনা 'আসতো', তাই লিখতেন। কিন্তু হয়তো অন্য একটা কারণও আছে। পদ্য রচনা এক বিশেষ ধরনের মনোযোগ দাবি করে—উপস্থিত করে অনেক বাধা এবং নতুন বাধাও তৈরি করে নেয়া যায়—সেই আত্মবিলোপে তিনি কি ক্ষণিকের জন্য তাঁর প্রার্থনার উত্তর শুনতে পেতেন? হাইকু লিখতে গিয়ে তিনি সতেরো মাত্রার জাপানি নিয়ম লঙ্ঘন করেননি—অর্থাৎ তাঁর শিল্পিতার দিকেও ঝোঁক ছিলো, চেষ্টা ছিলো—শুধু বলা নয়, ভাষার দ্বারা কিছু গড়ে তোলারও জন্য। অন্তত পক্ষে এ-কথা নিশ্চিত যে কবিতা লেখা তার পক্ষ বিনোদ অথবা ব্যায়াম ছিলো না—ব্যস্ত ব্যবসায়ীর রবিবাসরীয় চিত্রাঙ্কন নয় ; তাঁর কবিতার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের যোগ ছিলো বলেই সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন (আর সেগুলি অধিকাংশই হাইকু) ১৯৫৯ ও ১৯৬১ সালে, যখন তিনি সবচেয়ে অনবকাশ। আমি এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের কয়েকটি নমুনা ভাবানুবাদে উপস্থিত করছি —একজন সাধু মানুষের চিহ্ন হিশেবে এগুলি মূল্যবান, কবিতা হিশেবেও তুচ্ছ নয়।

১.

চলেছে যেন আমাকে নিয়ে ঠেলে
অজানা এক দেশের দিকে।
ক্রমশ পথ খাড়া,
হাওয়ায় আরো ঠাণ্ডা ধার,
না-জানা সেই প্রান্ত থেকে একটি বাতাস
কাঁপিয়ে যায় প্রত্যাশার
তন্ত্রীগুলো।

প্রশ্ন তবু :
পৌঁছবো কি—কোথাও—কোনোদিন
সেই যেখানে জীবন বেজে ওঠে,
স্বচ্ছ স্বর, শুদ্ধ সুর
স্তব্ধতার অন্তরালে।

২.

মুখে হাসি, ঋজু মন, কলুষের স্পর্শাতীত,
শিক্ষিত শরীর নম্য—এই সে মানুষ
যে হয়েছে যা তার সম্ভব ছিলো,
যে এমন স্বপ্রতিষ্ঠ—এবং প্রস্তুত
যে-কোনো মুহূর্তে সব—সব জড়ো ক'রে
একটি সরল
আহুতির পাত্রে ঢেলে দিতে।

৩.

স্তব্ধতার প্রতিধ্বনি ওঠে
অন্ধকারে রশ্মিবিচ্ছুরণ
আলো
খোঁজে তার প্রতিরূপ
সুরের ঝংকারে
নিশ্চলতা
যুদ্ধ করে মুক্তির চেষ্টায়
একটি শব্দের তলে
ধুলোয়

ছায়ায়
জীবনস্পন্দন
কী বিরল বিকাশ, মঞ্জরী
কী বিরল ফল

৪.
শূন্যতায়
নীরবতায় নিদ্রাহীন
ক্ষুদ্র ভ্রূণ
অন্ধকারে কাঁদে—
কবে, কখন, কবে?

৫.
দেবতারা
শোনেন উজ্জ্বল বাঁশি
জন্মের গুহায়।

৬.
চাঁদ ভেঙে দিলো বানরগুলোর ঘুম।
বিশ্বের নাভি ঘিরে
প্রার্থনা ঘোরে চাকা।

৭.
বিরাম তবে। কাঠকয়লার আগুন জ্বলে।
দর্পণের গভীরতায়
বিষ্ণু আছেন শান্ত।

৮.
আধো ঘুমে
তারপর সম্পূর্ণ জেগে উঠে
আমি সেই চীৎকার শুনলাম
যা আমাকে জাগিয়ে দিলো সেদিন।

সে ছিলো প্রহরী,
সমুদ্রের গাঢ় তিমিরে ভাসমান
ডুবন্ত মানুষের মতো,
সব দিক থেকে আলো,
কোনোদিক থেকে আলো নেই,
আলো তাকে পচিয়ে দিয়ো গেলো।

বহুদূর থেকে
শেষবারের মতো
সেই চীৎকার শুনলাম আমি,
আতঙ্কের চীৎকার
নিঃসঙ্গতার কণ্ঠস্বর
ভালোবাসার জন্য ক্রন্দন।
শিকার কে,
আর নিঃশব্দ শিকারী কোনজন
ঝাপসা সমুদ্রের উপর দিয়ে,
কালো-কালো গাছপালার মধ্য দিয়ে,
ভোর হবার অনেক, অনেক আগে—
কে?

৯.
এ এক নতুন দেশ
অন্য এক বাস্তবের জগৎ—
দিনের নয়?
না কি আমি এখানেই ছিলাম
আরো অনেক আগে, যখন দিনের জন্ম হয়নি?

আমি জেগে উঠলাম
এক সাধারণ সকালবেলায়, ধূসর আলো
রাস্তা থেকে ঠিক্‌রে-পড়া,
তবু মনে রইলো
সেই গাঢ়-নীল রাত্রি
বৃক্ষরেখার উপরে,
চাঁদের আলোয় উম্মুক্ত প্রান্তর,
আর ছায়ালীন চূড়া।
মনে রইলো অন্য সব স্বপ্ন,

এই একই পাহাড়ি দেশের স্মৃতি।
দু-বার আমি দাঁড়িয়েছিলাম শিখরগুলোতে,
থেমেছিলাম দূরতম হ্রদের ধারে,
নদীর পিছু-পিছু চলেছিলাম।
উৎসের দিকে।
আজ বদলে গেছে ঋতু
আর বেলা
আর আবহাওয়া।
তবু সেই একই দেশ :
ধীরে-ধীরে চিনতে পারছি মানচিত্র
পথ খুঁজে পাচ্ছি।

ভূমিকা : বরিস পাস্টেরনাক

(১৮৯০-৩০শে মে, ১৯৬০)

মস্কো নগরে, ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে, বরিস পাস্টেরনাক জন্মগ্রহণ করেন। পিতা লিওনিদ পাস্টেরনাক, চিত্রকর ও টলস্টয়ের বন্ধু ; মাতা, রোজা কাউফম্যান-পাস্টেরনাক, সুরশিল্পী। পিতামাতার প্রথম সন্তান বরিস প্রথম যৌবনে স্থির করতে পারেননি তাঁর জীবনের বৃত্তি কোনটি হবে। ঝোঁক ছিলো সংগীতের দিকে, কিছুকাল তার চর্চাও করলেন, এদিকে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনবিষয়ক পড়াশুনো চলছে। ছেলেবেলায় ট্রেনে একবার একটি ক্ষীণকায় লাজুক বিদেশীকে দেখেছিলেন ; পরে জানতে পারেন তিনি রাইনের মারিয়া রিলকে। বাড়িতে একদিন আবিষ্কার করলেন রিলকের কবিতার বই, কবি নিজেই লিওনিদ পাস্টেরনাককে উপহার দিয়েছিলেন। বরিস আইন ছেড়ে ভর্তি হলেন দর্শনে, তারপর হঠাৎ একদিন মা-র সঞ্চিত অর্থ সম্বল ক'রে চ'লে এলেন জর্মানির মারবুর্গ শহরে দর্শন পড়তে। কিন্তু সেখানে ডিগ্রি নেওয়া হ'লো না ; কিশোর প্রেমের নায়িকার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হ'লো ; অবশিষ্ট অত্যল্প অর্থ নিয়ে ইতালিতে ভ্রমণ ক'রে স্বদেশে ফিরে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে আর-একবার জর্মানিতে যান, তারপর অবশিষ্ট জীবন জন্মভূমিতেই অতিবাহিত করেন।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মেঘের মধ্যে যমজ' ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় ; দ্বিতীয়, 'আমার বোন, জীবন' ১৯১৭-তে রচিত হ'য়ে প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। সঙ্গে-সঙ্গে রাশিয়ার অন্যতম প্রধান তরুণ কবিরূপে স্বীকৃত হলেন তিনি; তাঁর সমবয়সী কিউবিস্ট ও ফিউচারিস্ট কবিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য ঘটলো, কিন্তু তিনি নিজে কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভূত হলেন না। ইংরেজিতে *Safe Conduct* নামে অনূদিত আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ের সুন্দর বর্ণনা আছে। তাঁর এই সময়কার সাহিত্যিক সতীর্থরা—এসেনিন, মায়াকভস্কি, মারিয়া ৎসভেটাইয়েভা, বরিস পিলনিয়াক, ইউজেনে জামিয়াণ্টিন—১৯২৫ থেকে ১৯৪১-এর মধ্যে এঁরা সকলেই আত্মহত্যা করেন বা রহস্যময়ভাবে অবলুপ্ত হন ; কিন্তু বরিস পাস্টেরনাকের নিয়তি তাঁকে সত্তর বছর পর্যন্ত জীবিত ও সৃষ্টিশীল রেখেছিলো।

যদিও কবি হিশেবে খ্যাতনামা, সোভিয়েট সমালোচকদের দাক্ষিণ্য তিনি কখনোই লাভ করেননি। 'দুর্বোধ', 'রীতিপ্রধান', 'ব্যক্তিগত', 'জনগণের সংযোগরহিত' —এই সব বিশেষণ তাঁকে দিনে-দিনে নিন্দনীয় ক'রে তুলেছিলো। তবু, ১৯৪৫ পর্যন্ত তাঁর নতুন-নতুন কাব্য ও গদ্যগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হবার বাধা ঘটেনি ; কিন্তু এর পরেই তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতা এমন উদগ্র হ'য়ে উঠলো যে পাস্টেরনাক প্রায় একান্তরূপে অনুবাদ-

কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। বহু ভাষায় অভিজ্ঞ তিনি : শেক্সপীয়র, গ্যেটে, শিলার, ভেরলেন, শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য কবিদের রচনার, এবং আর্মানি ও জর্জীয় ভাষার কবিতার বহু উত্তম অনুবাদ প্রণয়ন ক'রে কোনোরকমে স্বীয় জীবিকার সংস্থান ও মাতৃভাষার সাহিত্যকে অনবরত সমৃদ্ধ ক'রে চললেন ; আধুনিক রুশীয় রঙ্গমঞ্চে তাঁরই অনুবাদে শেক্সপীয়র ও শিলারের নাটক অভিনীত হ'য়ে থাকে ; তাঁর 'ফাউস্টে'র অনুবাদ একটি স্মরণীয় কীর্তি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী স্টালিন আমলে পাস্টেরনাক একটিও মৌলিক রচনা প্রকাশ করেননি বা করতে পারেননি। তাঁর পূর্বপ্রকাশিত পুস্তকসমূহ অপ্রকাশে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে ; তাঁর নাম উঠলে নব্য সাহিত্যিকেরা বলাবলি করেন, 'কে পাস্টেরনাক? ও, সেই অনুবাদক।' তাঁর জীবন হ'য়ে উঠলো স্বদেশেই নির্বাসিতের মতো : মস্কোর উপকণ্ঠে এক গ্রামে তাঁর বাসা, দেশবিদেশের পুস্তকে পরিবৃত হ'য়ে তাঁর দিন কাটে ; যে-'পাশ্চাত্য সংস্কৃতি' নিখিলরাশিয়ায় নিয়তধিকৃত, তার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে মানস সংযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন তিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে, যখন রুশ মনীষীরা একটি মুক্তির হাওয়া অনুভব করেছিলেন, তখনই 'ডাক্তার জ়িভাগো' উপন্যাসের পরিকল্পনা তাঁর মনে আসে ; হয়তো, পরবর্তী দারুণতর দুঃসময়ে, প্রকাশের আশা প্রায় না-রেখে, নিজের নির্জনের মধ্যে উপন্যাসটি তিনি লিখতে আরম্ভ করেন।

'ডাক্তার জ়িভাগো'-র বৈদেশিক প্রকাশ, তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি, এবং পরবর্তী বিক্ষোভ ও আন্দোলন—এ-সব আজ কোনো পাঠকেরই অজানা নেই। অবজ্ঞার অপমানের চেয়েও পাস্টেরনাকের মনে অনেক বেশি কঠিন হ'য়ে বাজলো এই অনভিপ্রেত তর্কদীর্ণ প্রকাশ্যতা। "নোবেল প্রাইজ" নামক কবিতায় এই সময়কার বেদনা ক্ষরিত করলেন :

আমি যেন এক খাঁচায় বদ্ধ জন্তু।
স্বস্থ, স্বাধীন আলোকে আনন্দিত
আজো কোনোখানে রয়েছে মানুষ—কিন্তু
আমি পরিবৃত শিকারির পদশব্দে।

কিন্তু বলো তো কী আমার দুষ্কৃতি?
আমি কি দস্যু? অথবা পিশুন ধূর্ত?
মাতৃভূমির রূপের পুণ্যস্মৃতি
জাগিয়ে, যে-আমি জগতে করেছি আর্ত?

(বর্তমান লেখকের অনুবাদ)

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, তিক্ততম মুহূর্তেও দেশত্যাগী হবার কল্পনা করলেন না ; তবু সোভিয়েটতন্ত্রের বিরুদ্ধতাকে প্রশমিত করা অসম্ভব হ'লো। সোভিয়েট লেখক-সংঘ থেকে বিতাড়িত হলেন তিনি ; তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতিকে দুয়ো দেবার জন্য বহু লেখনী

ও রসনা উদ্ধত হ'য়ে উঠলো ; যে-উপন্যাস রাশিয়ার মধ্যে প্রায় কেউই পড়তে পেলো না সেটিই হ'য়ে উঠলো তাঁর কলঙ্কচিহ্ন, তাঁর নিন্দনীয়তার নির্দশন। এই দুঃশীলতার প্রতিবাদে বহু কণ্ঠ ধ্বনিত হ'লো অন্যান্য দেশে ও মহাদেশে ; বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জানালেন ; এবং বাদানুবাদ এমনভাবে স্ফীত হ'তে লাগলো যেন তাঁকে নিয়ে লৌহ যবনিকার এপারে-ওপারে রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধ চলছে। পাস্টেরনাকের কবিস্বভাবের পক্ষে এ যে কতো বড়ো বেদনা তা বলার কোনো দরকার করে না।

এই অদ্ভুত সংকট থেকে মৃত্যুর করুণা তাঁকে উদ্ধার করলো। ৩০শে মে, ১৯৬০, রাত্রিকালে, স্বল্পস্থায়ী রোগভোগের পর এমন একটি জীবনের অবসান হ'লো, যার সাধুতা, সৃষ্টিশীলতা ও অবৈকল্য এই সন্তপ্ত মধ্য-শতকে মনুষ্যত্বের একটি উদাহরণ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। পেরেডেলকিনো গ্রামে, যেখানে জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি কাটিয়েছিলেন, সেখানেই পাস্টেরনাক শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। জানলা দিয়ে দেখা যেতো একটি গ্রাম্য কবরখানা, তার মধ্যে অবস্থিত একটি নীলবর্ণ গির্জের ক্রুশচিহ্ন অনবরত তাঁর চোখে পড়তো ; সেখানেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমেত, তাঁর দেহকে যেন সমাধিস্থ করা হয়, এই ইচ্ছা বহুবার প্রকাশ করেছিলেন। ভাবতে ভালো লাগে যে কবির এই অন্তিম আকাঙ্ক্ষাটি অপূর্ণ থাকেনি, এবং যদিও মস্কো রেডিও তাস্ সংবাদসংঘ তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে সচেতনভাবেই নীরব ছিলো, তবু তাঁর অন্ত্যক্রিয়ায় বহু লেখক ও শিল্পী অনুগমন করেছিলেন, পাশ্চাত্য প্রথামতো মৃতের স্মরণে প্রশস্তি-ভাষণও উচ্চারিত হয়েছিলো। পিতামাতা ছিলেন ইহুদী ধর্মাবলম্বী, কিন্তু পাস্টেরনাক পরিণত বয়সে যীশুকে আবিষ্কার করেন ; 'খ্রিষ্ট এসেছিলেন আমার কাছে, তাঁকে না-পেলে এই যুগের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারতাম না,' তাঁর মুখের এই কথাটি সম্প্রতি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ডাক্তার ঝ়িভাগো' উপন্যাস, ও ঝ়িভাগোর কবিতাগুচ্ছ, তাঁর খ্রিষ্টিয় প্রেরণায় প্রোজ্জ্বল।

জ়িভাগোর কবিতা

চ'লে আসছি, এমন সময় দোকানি বললেন, 'ডক্টর জ়িভাগো' এসেছে, নেবেন একখানা?' আর তখন আমার মনে পড়লো যে এই বইখানার জন্যেই আজ বেরিয়েছিলুম।

বাড়ি এসে প্রথমেই কবিতাগুলো পড়লাম, তিনটি বা চারটি, অন্যগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করলাম, তারপর আর পড়লাম না। যথেষ্ট; একবারের মতো এই যথেষ্ট, এ-ক'টিই যথেষ্ট। একসঙ্গে বেশি নেয়া যায় না, মনের উপর কবিতা যে-কাজ করবে তার জন্য সময় দিতে হয়।

আমার মনে কথা জাগলো : 'আশ্চর্য!' 'কী চাপা আর কী গভীর!' 'কোথাও-কোথাও রিলকের মতো নয় কি?' 'যেন চীনে কবিতার আদল আসে।'—তাহ'লে এক নতুন কবির সংস্পর্শ, আবার, কতকাল পরে। তাহ'লে আবার য়োরোপ থেকে কবিতা এলো।

হাল আমলের পশ্চিমী কবিতা আধুনিক হবার চেষ্টায় কবিতা হ'তে পারছে না। অন্তত, তার অধিকাংশই এই রকম। সাঁ-জন পের্স বা খিমানেৎ-এর মতো প্রবীণ ও প্রখ্যাত নামগুলির সামনে আমি শিক্ষার্থীর মতো দাঁড়াতে পেরেছি, কিন্তু তাঁদের মধ্যে বিগলিত হ'তে পারিনি। ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা আমেরিকা থেকে আর যা পাওয়া যাচ্ছে, তার সবচেয়ে উঁচুতে আছে অডেনের নৈপুণ্য, আর তলার দিকে কলে-ছাঁটাই দোকানের-জানলার ঝকঝকানি। এর আগে পাস্টেরনাকের অন্য যে-ক'টি কবিতা পড়েছিলাম। তা থেকে তাঁকে মনে হয়েছিলো আধুনিকতার লক্ষণসম্পন্ন একজন 'ভালো' কবি, অন্য যে-কোনো একজন 'ভালো' কবিরই মতো; কিন্তু 'ডক্টর জ়িভাগোর কবিতাগুচ্ছে' তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি আমাদের হৃৎস্পন্দনে এমন বেগ আনতে পারেন যাতে আমরা 'প্রশংসা' করতে ভুলে যাই; যে তিনি তাঁদেরই একজন যাঁদের আমরা আমাদের মনের অকথ্য গোপনতার অংশ দিতে প্রস্তুত। প্রমাণ করেছেন যে তাঁর বাঁচা সার্থক হয়েছে, সার্থক হয়েছে তাঁর দুঃখ পাওয়া আর প্রায় সত্তর বছর বয়স।

আশ্চর্য এই কবিতাগুলির সরলতা, যা বুঝতে আমাদের একটুও দেরি হয় না, অনেক ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা তিনি অর্জন করেছেন। আধুনিক কবিতার চরিত্রই এই যে সে যেটুকু বলে তার চেয়ে অনেক বেশি তার বলবার থাকে। সেইজন্যই তা ঘন ও তীব্র হ'তে পেরেছে, আর সেইজন্যই তাকে দুর্বোধ হ'তে হ'লো। এই বাদ দেবার জেদেই উনগারেত্তির কবিতা এক পঙ্‌ক্তিতে সমাপ্ত হয়, একজন এলিয়ট আশা করেন যে পাঠকমাত্রেই পণ্ডিত হবে। কিন্তু কখনো-কখনো আমরা কে না আকাঙ্ক্ষা করেছি এমন কবিতা যাতে যথাসম্ভব সবই বাদ গেছে, অথচ যাকে পাবার জন্য পণ্ডিত হ'তে হয় না, জানতে হয় না নৃতত্ত্ব ও বৌদ্ধধর্ম, বা কবির ব্যক্তিগত জীবনী? কী দুরূহ এই সমন্বয় তা আমরা তখনই বুঝি, যখন দেখতে পাই আধুনিক কবিতায় তার উদাহরণ কত বিরল। জ়িভাগোর কবিতায়, আমি বলতে চাই, পাস্টেরনাক এই অসাধ্যসাধন করেছেন।

এই যে কথাগুলো লিখছি, এগুলো এক 'সরল' পাঠকের অভিজ্ঞতার বিবরণ। পাস্টেরনাকের জীবনী বিষয়ে অল্পই জানি আমি। তাঁর পূর্ব-রচনাও বেশি পড়িনি। প্রথম যখন বোদলেয়ার বা রিলকে পড়েছিলাম তাঁদের বিষয়েও অজ্ঞ ছিলুম। কিন্তু কবিতাগুলো যেন কাগজ থেকে লাফিয়ে উঠে মুখের উপর মারলে আমাকে। এবারেও তা-ই হ'লো। জানি, আনুষঙ্গিক তথ্য জানলে পরতে-পরতে আরো অর্থ বেরিয়ে আসবে, কিন্তু এই প্রথম অভিঘাতটাই আসল। কবিতার বিষয়েই কথা হচ্ছে এখানে, কবির নয়। কবির জাতি, দেশ, ধর্ম, এমনকি তাঁর নাম পর্যন্ত যদি নাও জানি, তাতে কি কবিতার কিছু এসে যায়? এমনকি, উল্টোটাও সম্ভব হ'তে পারে ; "নাইটিঙ্গেল" ও "গ্রীশিয়ান আর্ন"-এর আরক্ত ও আতুর রসভার থেকে কোনো পাঠক হয়তো অনুমান করতে পারতেন যে লেখক একজন প্রেমে-পড়া প্রতিভাবান যুবা, যার মৃত্যু আসন্ন। তেমনি, ভ্লিভাগোর কবিতা যিনি লিখেছেন তিনি যে একজন মহাভক্ত ও মহাপ্রেমিক, আর অনেক বয়স অবধি বেঁচে থেকে তিনি যে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, তা আর কাউকে ব'লে দিতে হয় না।

আর একটি বিস্ময় এই যে পঁচিশটি কবিতার মধ্যে অন্তত সাতটি আছে সরাসরি প্রেমের কবিতা, যা বর্তমান শতকে ইএট্‌স ছাড়া আর কোনো পাশ্চাত্য কবি লেখেননি। স্ত্রী-পুরুষের পার্থিব ভালোবাসা, যার উচ্চারণ উনিশ শতকে বোদলেয়ার পর্যন্ত অকুণ্ঠিত, আধুনিক কাব্যে তা সাধারণ পটভূমিকার কাজ করে ; সেটা আর প্রধান নেই, সমগ্রভাবে জীবন থেকে ছাপিয়ে উঠেছে। উত্তরজীবনে ইএট্‌সকেও ঋজুকথন ত্যাগ করতে হ'লো। এর ফলে কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই, আর আমরা তিন দশক ধ'রে এতেই অভ্যস্ত হয়েছিলাম। প্রায় ধ'রেই নিয়েছিলাম যে এই আত্মসচেতন যুগে চাতুরী ভিন্ন প্রেমের কথা বলা যাবে না। পাস্টেরনাক আমাদের সেই ভুলও ভাঙালেন। অন্য কবিরা জীবনের অন্যান্য অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রেমকে বুনে দেন, পাস্টেরনাক প্রেমের সূত্রেই অন্য সব অভিজ্ঞতাকে গেঁথেছেন। বরফ-চিবোনো আধ-পাগলা মেয়ে, আঙুলে-ফুটে-যাওয়া শেলাইয়ের ছুঁচ, পিটার্সবার্গের জানলা থেকে দেখা শাদা রাত্রি—এই সব সহজ ও বাস্তব তথ্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সহজে তিনি আমাদের শুনিয়ে দিলেন নক্ষত্রের গান, দেবদূতের বন্দনা। নারীর 'পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা'কে চিরন্তন ভক্তির পাত্র ক'রে তুলে মানুষের মর্যাদা ফিরিয়ে দিলেন। এই বৃদ্ধের হাত থেকে, কয়েক মুহূর্তের জন্য, আমাদের হারানো যৌবন আমরা ফিরে পেলাম।

আমি যতদূর জানি, পাস্টেরনাক ছন্দে ভিন্ন লেখেন না, তাঁর মিলের আসামান্যতার খ্যাতিও শুনেছি। কিন্তু সামনে পেয়েছি ইংরেজি অনুবাদ, তাতে ('রূপকথা'টিতে ছাড়া) ছন্দ মিল কিছুই নেই ; মিলের বিন্যাস বিষয়েও ইংরেজি অনুবাদক কোনো ইঙ্গিত দেননি। রুশ ভাষা এক বর্ণ জানি না, মূলের ধ্বনি বা শব্দের দ্যোতনা বিষয়ে কিছুই ধারণা নেই। তবু, আমি যেমন মোটামুটি ইংরেজি অনুবাদ থেকেও অনেক কিছু পেয়েছি, তেমনি কোনো-কোনো সংবেদনশীল পাঠক হয়তো এই চলনসই বাংলা থেকেও পাবেন। কবিতায় সারবস্তু যত বেশি থাকে ততই অনুবাদ তাকে কম জখম করতে পারে।

১৯৫৮

হ্যামলেট

ক্ষান্ত কলরোল। আমি বেরিয়ে আসি রঙ্গমঞ্চে।
দরজার খুঁটিতে হেলান দিয়ে
দূর প্রতিধ্বনি থেকে আন্দাজ ক'রে নিতে চাই
আমার আয়ুষ্কালের আসন্ন ঘটনাগুলিকে।

হাজার দূরবীনের দৃষ্টি ধারে-ধারে
আমাকে তাক ক'রে আছে রাতের অন্ধকার।
আব্বা, পিতা, যদি সম্ভব হয়,
আমার এই পাত্র হোক হস্তান্তরিত।

তোমার কঠিন পণ ভালোবাসি আমি,
আমার ভূমিকার অভিনয়ে আছি সম্মত।
কিন্তু এবার এক ভিন্ন পালা শুরু হ'লো ;
এই একবারের মতো দাও আমাকে নিষ্কৃতি।

কিন্তু অঙ্কগুলির পারম্পর্য অনড়
আর পথের শেষ আমাকে মুক্তি দেবে না ;
নিঃসঙ্গ আমি ; সব ডুবে গেলো ধর্মান্ধের শঠতায়।
মাঠ পেরোনোর মতো সহজ নয় বেঁচে থাকা।

৩০ মার্চ ১৯৬০

মার্চ

রৌদ্রে ঘর্মাক্ত পৃথিবী,
বনের খাদ উন্মাদ প্রাণে ফেটে পড়ে,
বসন্ত—ঐ সোমত্ত গয়লানি—
তার দুই হাতে ফেনিয়ে ওঠে কাজ।

রাস্তা থেকে বারান্দায় নিয়ে আসে
বসন্ত, বাসন্তী কথাবার্তা,
আর সেই হাওয়া—যাতে খ্রিষ্টপ্রসাদের স্বাদ লেগে আছে,
আর কাঠকয়লার বাসন্তী আঘ্রাণ।

আর বারান্দায় জড়ো-হওয়া খঞ্জদের দিকে
মার্চ দেয় ছড়িয়ে তার তুষার,
যেন কেউ সিন্দুকটাকে বের ক'রে এনে
খুলে, বিলিয়ে দিচ্ছে সব—
একেবারে শেষ টুকরোটি সুদ্ধ।

ভোর পর্যন্ত গান থামে না।
বুক ভ'রে কেঁদে নেবার পর
স্তোত্রপাঠ, শিষ্যচরিত
আরো মৃদু হ'য়ে নেমে আসে
শূন্য, আলো-জ্বলা রাস্তায়।

কিন্তু মাঝরাতে মানুষের আর সাড়া নেই, পশুরাও নিস্তব্ধ।
কেননা বসন্তের রব তারা শুনেছে—
ঋতুবদলের লগ্ন আসামাত্র
পুনরুত্থানের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে
উৎপাটিত হবে মৃত্যু।

২৮ এপ্রিল ১৯৬০

শাদা রাত্রি

দেখছি দূর অতীত
পিটার্সবার্গে নদীর ধারে একটি বাড়ি।
স্টেপির এক তালুকদারের কন্যা
তোমাকে আসতে হ'লো কুর্স্ক থেকে ছাত্রী হ'তে।

সুন্দরী ছিলে, যুবকদের প্রিয়
সেই শাদা রাত্রি ভ'রে আমরা দু-জন

ব'সে ছিলুম তোমার জানলার পাটাতনে
স্কাইস্ক্রেপারের চুড়ো থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে।

গ্যাসের প্রজাপতির মতো রাস্তার বাতিগুলো
উষায় স্পৃষ্ট, কেঁপে উঠলো।
ঐ ঘুমন্ত দূরের মতো মৃদু
আমার কথা, তোমাকে।

আর আমরা, ভীরু নিষ্ঠায়,
বাঁধা ছিলুম এক রহস্যে,
তীরহীন নেভা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ
পিটার্সবার্গ শহরটার মতো।

বাইরে, বহু দূরে, ঘন অরণ্যে,
বসন্তের সেই শাদা রাত্রিটিতে
নাইটিঙ্গেলরা পূর্ণ ক'রে দিলো কানন
তাদের বন্দনার বজ্রনাদে।

পাগল তান গড়িয়ে চলে অবিরাম,
ছোটো, নগণ্য সেই পাখির কণ্ঠ
জাগিয়ে দিলে পুলকের চঞ্চলতা
মন্ত্রমুগ্ধের অরণ্যের গভীরে।

গুড়ি মেরে সেখানে এলো রাত্রি,
খোলা-পায়ের বাউণ্ডুলের মতো জড়িয়ে ধরলো বেড়াগুলোকে,
তার পিছনে, জানলার পাটাতন থেকে,
ঝুলে রইলো ধোঁয়ার মতো আমাদের কথাবার্তা।

প্রতিধ্বনির নাগালের মধ্যে
বেড়া-দেয়া বাগানে
আপেলের ডাল, চেরিগাছের ডাল
সাজ প'রে নিলো শুভ্র মঞ্জরী।

আর প্রেতের মতো শাদা, গাছগুলি
ভিড় ক'রে রইলো রাস্তায়

যেন হাত নেড়ে বিদায় দিচ্ছে
সেই শাদা রাত্রিকে, যে বড্ড বেশি দেখে ফেলেছিলো।

২৪ অক্টোবর ১৯৫৮

বসন্তের বন্যা

বসন্তের বরফ-গলা প্লাবিতপথ অরণ্যের
মধ্য দিয়ে ক্লান্ত এক ঘোড়সওয়ার
উরালে কোন বিজন চষা খেতের দিকে চলছে—
অস্তরাগের আগুন তখন মরন্ত।

অধীর ঘোড়া লাগামে করে দংশন ;
পিছনে তার ঝর্নাগুলো অনেক নালায় ছড়িয়ে গিয়ে
কলস্বরে ফেনিয়ে তোলে
অশ্বখুরের প্রতিধ্বনি।

কিন্তু যখন অশ্বারোহী লাগাম ছেড়ে
মন্দগতি,
বসন্তের বন্যাধারা গড়িয়ে চলে
বজ্রনাদে।
উঠলো হেসে কে যেন, ঐ কান্না কার?
পাষাণ-তলে পাষাণ হ'লো চূর্ণ।
কম্প তুলে ঘূর্ণিজলে এলিয়ে পড়ে
ছিন্নমূল বৃক্ষ।

অস্তরাগের আগুন-জ্বালায়
ডালেপালায় কয়লা-রঙা দিগন্তরে
উঠছে বেজে পাগল নাইটিঙ্গেলের
কণ্ঠ, যেন উচ্চকিত ঘণ্টা।

ঐ যেখানে অশ্রুমতী লতা
এলিয়ে বৈধব্য-বাস খাদের ধারে নুয়ে পড়ে,

সেখানে তার কণ্ঠে ফোটে সাতটি বাঁশি
গল্পে যেমন ডাকাত-নাইটিঙ্গেলের।

বলাৎকার? তবে কি দুরদৃষ্ট কোনো,
দুঃখ, জ্বর আসন্ন?
অরণ্যের ঝোপের ফাঁকে তীক্ষ্ণ এই ছররা-গোলা
ছুটছে কাকে হানতে, কেউ জানবে না?

আসামিদের গুপ্ত বাসার বিবর থেকে বেরিয়ে এসে
অরণ্যের দেবতা ঐ গানের পাখি
দিক না দেখা কৃষক-সেনার পায়ে-চলা, ঘোড়ায়-চড়া
সান্ত্রীদলের মুখোমুখি।

আকাশ, মাঠ, ধরিত্রী ও অরণ্য
স্পৃষ্ট এই যাতনা, সুখ, বেদনাময় উন্মাদনায়;
বিরল ঐ শব্দ তারই সন্নিপাত?
আনন্দ, আর বেদনাময় উন্মাদনা।

২৮ এপ্রিল ১৯৬০

জবাবদিহি

যেমন একদিন অদ্ভুতভাবে বাধা পেয়েছিলো
তেমনি অকারণে ফিরে এলো জীবন।
আমি আছি সেই পুরোনো চালের রাস্তাতেই,
যেমন ছিলুম সেই গ্রীষ্মের দিনে, সেই মুহূর্তে।

একই লোকেরা, একই দুশ্চিন্তা।
সেই যেদিন মরণসন্ধ্যা ব্যস্ত হ'য়ে
সূর্যাস্তকে পেরেক ঠুকে ঝুলিয়ে দিলে পার্কের দেয়ালে
তারপর থেকে সূর্যাস্তের তাপও তো জুড়োলো না।

শস্তা ডোরা-কাটা সুতির কাপড়ে
মেয়েরা এখনো জুতো ক্ষইয়ে ফ্যালে রাত্রে,

চিলেকোঠায়, লোহার ছাতের উপর
ক্রুশবিদ্ধ হয় তেমনি।

এখানে একজন ক্লান্ত পা ফ্যালে
চৌকাঠে, বাইরে ;
আস্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে
তয়খানা থেকে, উঠোন পেরিয়ে।

আবার আমি ছুতোনাতা তৈরি রাখি,
আবার উদাসীন হ'য়ে যাই সব-কিছুতে।
আরো একবার আমাদের প্রতিবেশিনী
রাস্তায় ঘুরে, একা থাকতে দেয় আমাদের।

কেঁদো না, ফোলা ঠোঁট দুটি উল্টিয়ে
গুটিয়ে নিয়ো না ভাঁজ ফেলে ;
জানো না, বসন্তের জ্বর জন্ম দিয়েছে এই শুষ্কতাকে,
তুমি কাঁদলে তা ফেটে যাবে।

হাত সরিয়ে নাও আমার বুক থেকে।
আমরা যে অতিবৈদ্যুতিক তার।
সাবধান, নয়তো আচমকা
আবার দু-জনে জড়িয়ে যাবো একসঙ্গে

কাটবে বছরের পর বছর, তুমি বিয়ে করবে।
ভুলে যাবে এই অস্থির অবস্থা।
নারী হওয়া মস্ত বড়ো ব্যাপার,
অন্যদের পাগল ক'রে দেবার নামই বীরত্ব।

আর আমি—আমার জন্য রইলো
শ্রদ্ধা, এক আজীবন সেবকের ভক্তি,
যার লক্ষ্য সেই মহাবিস্ময়, নারীর হাত দু-খানি,
তার পিঠ, কাঁধ, গ্রীবা।

এই রাত্রি আমাকে এঁটে দিক
যতো না দুঃখের বলয়ের পর বলয়ে,

উল্টো দিকের টান আরো জোরালো
ভেঙে বেরোবার ইচ্ছেটাই আসল।

২৪ অক্টোবর ১৯৫৮

শহরে গ্রীষ্ম

আধো গলায় কথাবার্তা।
সম্পূর্ণ চুলের গুচ্ছটি
ঘাড়ের উপর থেকে তুলে নেয়া হ'লো
ক্ষিপ্র ভঙ্গির চমকে।

ভারি চিরুনির তলা থেকে
এক হেলমেট-পরা নারী সতর্ক চোখে তাকায়,
বিনুনি-করা চুলের বোঝা সুদ্ধ
মাথাটি তার পিছনে হেলানো।

বাইরে, তপ্ত রাত
ঝড়ের দেয় সংকেত,
রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে লোকেরা
ত্রস্ত পায়ে বাড়ির দিকে।

মেঘের গুরুগুরু ডাক
ছোটো, প্রতিধ্বনিতে তীক্ষ্ণ ;
জানলার পর্দাটাকে
দুলিয়ে দেয় হাওয়া।

শব্দ নেই,
গুমোট।
আকাশটাকে তল্লাশ ক'রে ফেরে
বিদ্যুতের আঙুল।

আর, যখন উষায় ভরপুর হ'য়ে
উত্তপ্ত সকাল

রাত্রি বর্ষণের পর
রাস্তার খোদলের জল নিয়েছে শুকিয়ে,

তখন, আদ্যিকালের সুগন্ধি,
ফুলন্ত লেবুগাছগুলো
ভ্রূকুটি করে
রাত্রে তাদের ঘুম হয়নি ব'লে।

৩০ মার্চ ১৯৬০

হাওয়া

এই আমার অবসান, কিন্তু তোমাকে আরো বাঁচতে হবে।
হাওয়া, কান্নায় আর নালিশে নিরন্তর
কাঁপায় বাড়ি, দুলিয়ে দেয় অরণ্য—
প্রত্যেকটা পাইনগাছকে আলাদা ক'রে নয়,
সব গাছ একসঙ্গে
ঐ সম্পূর্ণ সীমাহীন সুদূর সুদ্ধ দুলিয়ে দেয়
যেন সারি-সারি পালের জাহাজ
উপসাগরের তুফান পেরিয়ে নোঙর ফেললো বন্দরে।
কেন কাঁপায়? লক্ষ্যহীন আক্রোশে?
না কি কোনো ক্ষতি করার জন্য?
না—ও যে নিজেই সন্তপ্ত, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছে
তোমার জন্য এক ঘুম-পাড়ানি গান।

২৫ এপ্রিল ১৯৬০

নেশা

উইলো গাছ, আইভিলতায় ঘেরা,
ঝড়ের দিনে লুকিয়েছি তার তলায়,

এক চাদরেই দু-জনে রই ঢাকা।
আমার বাহুবন্ধে বাঁধা তুমি।

ভুল হ'লো যে। ঝোপের গাছগুলো
আইভিতে নয়, কড়া নেশায় ঘেরা।
তাহ'লে, বেশ, চাদরটাকে টেনে
নাও মাটিতে পেতে।

২৮ এপ্রিল ১৯৬০

ইণ্ডিয়ান সামার

ক্যাম্বিসের মতো মোটা হ'যে উঠলো কালো আঙুরের পল্লব।
বাড়ির মধ্যে হাসি, কাচের রিনিঠিনি আওয়াজ।
কুটনো কুটছে ওরা, মেশাচ্ছে ঝাল, তৈরি করছে আচার,
লবঙ্গ তোলা হচ্ছে বৈয়মে।

অরণ্যের খুনসুটি এই সব আওয়াজ দিচ্ছে ছড়িয়ে,
গড়িয়ে চলে খাড়াই বেয়ে আস্তে—
ক্যাম্পে জ্বলা আগুনের মতো সূর্য
হেজেলের ঝোপগুলোকে ঝলসে দিয়েছে সেখানে।

পথ সেখানে খাদের দিকে নেমে গেছে;
কষ্ট হয় বিধ্বস্ত গাছগুলোর জন্য,
আর হেমন্ত—ঐ বুড়ো ছেঁড়া-ন্যাকড়ার ব্যাপারি
সব-কিছু ঝেঁটিয়ে নিয়ে যে নালায় ফেলছে—
তার জন্যেও কষ্ট লাগে মনে :

কষ্ট হয়, পৃথিবীটা সরল ব'লে
(যা-ই বলুক না চালাক লোকেরা),
নুয়ে-পড়া ঝোপের জন্যও কষ্ট
আর যেহেতু কিছু নেই আর শেষ নেই।

যখন চোখের সামনে সব যাচ্ছে জ্ব'লে
আর হেমন্তের শাদা ঝুলকালি
মাকড়শার জালের মতো জানলা দিয়ে নেমে আসে
তখন কষ্ট, কেন তাকিয়ে থাকার কোনো অর্থ নেই?

বাগানের বেড়া ডিঙিয়ে একটি পথ
বার্চবনের মধ্যে হারিয়ে গেলো।
বাড়ির মধ্যে জটলা আর হাসির শব্দ,
আর দূরে সেই একই হাসি, একই জটলা।

২৭ এপ্রিল ১৯৬০

বিয়েবাড়ি

আঙিনার প্রান্ত পেরিয়ে
এসেছে দলে-দলে অতিথি,
কনের বাড়িতে ভোর অবধি
ফুর্তি করবে ব'লে।

বাড়িওলার বনাতে ছাওয়া দরজার পিছনে
গালগল্পের টুকরো
একটা থেকে সাতটা পর্যন্ত
শান্ত।

কিন্তু ভোরবেলা
যখন মনে হয় অনন্তকাল ঘুমোনো যায়,
তখন, বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে,
হার্মোনিয়ম বেজে ওঠে আবার।

গাইয়েটি আবার দেয় ছিটিয়ে
হাততালির ফোয়ারা,
পাথরের মালার ঝলমলানি ;
আস্ত দলটির হুল্লোড়।

যারা ঘুমিয়ে আছে তাদের বিছানায়
উৎসব থেকে ছিটকে
ফেটে পড়ে নাচের সুর, কথার বকবকি—
আবার, বার-বার।

তুষারের মতো শাদা একটি মেয়ে
ময়ূরের মতো নরম চ'লে আসে
সারি-সারি ভিড়ে, শিস দেবার আওয়াজের মধ্যে,
আসে নিতম্ব দুলিয়ে।

মাথা ঝেঁকে,
ভঙ্গি তুলে ডান হাতটিতে,
নাচতে শুরু ক'রে দেয় শানের উপর
ময়ূরের মতো।

হল্লা, খেলা, ফুর্তি, থেমে যায় হঠাৎ ;
নাচের টিপ-টিপ তাল
যেন তলিয়ে যায় পাতালে,
যেন জলের মধ্যে ডুবে যায়।

উঠোনে গোলমাল উঠছে জেগে ;
কথাবার্তায়,
হাসির দমকের মধ্যে,
মিশে যাচ্ছে কেজো শব্দের প্রতিধ্বনি।

ধূসর-নীল ঘূর্ণিহাওয়া উঠলো ;
এক ঝাঁক পায়রা
খোপ থেকে উড়াল দিয়ে
উঠে গেলো সীমান্তহীন আকাশের উঁচুতে।

যেন কেউ, ঘুম থেকে উঠে,
ওদের পাঠিয়ে দিলে
বর-কনের পিছন-পিছন
অনেক, অনেক বছরের আয়ু কামনা ক'রে।

আর জীবন মানে তো একটি মুহূর্ত শুধু,
শুধু অন্যদের মধ্যে
নিজের এই গ'লে যাওয়া,
যেন উপহার দিচ্ছি ওদের কাছে—নিজেকে ;

শুধু এই বিয়ের রাত্রি
সব ক-টা জানলার মধ্য দিয়ে রাস্তা থেকে বিস্ফোরিত,
শুধু এক গান, এক স্বপ্ন,
এক ধূসর-নীল পায়রা।

২৫ এপ্রিল ১৯৫৮

হেমন্ত

আমার স্ত্রীপুত্রকে ছড়িয়ে যেতে দিয়েছি আমি,
প্রিয়জন সব বিচ্ছিন্ন।
এক জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গতায়
ভ'রে আছে প্রকৃতি আর আমার হৃদয়।

আর এখানে আমি তোমার সঙ্গে, ছোট্ট কুঠুরিতে
বাইরে, মরুর মতো জনহীন অরণ্য।
যেমন সেই গানে, তেমনি সব রাস্তাঘাট
আগাছায় প্রায় ছেয়ে গেলো।

দেয়ালের তক্তাগুলি বিষণ্ণ
আমাদের দু-জনকে ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পায় না ব'লে।
কিন্তু আমরা তো কখনো ভাবিনি যে টপকে যাবো বাধা।
সাধু হবে আমাদের মৃত্যু।

একটায় টেবিলে খেতে বসবো দু-জনে, উঠবো তিনটে বাজলে,
আমার হাতে বই, তুমি তুলে নেবে শেলাই।
ভোরবেলা মনে আনতে পারবে না
কখন আমরা চুমো খাওয়া থামিয়েছিলুম।

পল্লব, তোলো মর্মরধ্বনি, ছিটিয়ে দাও নিজেদের
আরো, আরো বেপরোয়া, আরো, আরো উজ্জ্বল,
গত কালের তিক্ত পেয়ালা ভ'রে দাও
আরো, আরো ভ'রে দাও আজকের বেদনায়।

বাসনা, আনন্দ, ভক্তি,
ছড়িয়ে পড়ুক সেপ্টেম্বরের কলরোলে :
আর তুমি যাও, এই ফাটা গলার হেমন্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকো,
হয় উন্মাদ হ'য়ে যাও, নয় শান্ত।

বন যেমন পাতাগুলিকে
তেমনি তুমি ছুঁড়ে ফ্যালো তোমার জামা-কাপড়।
রেশমি ফিতেওলা ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে
তুমি ঝ'রে পড়ো আমার বাহুবন্ধে।

জীবন যখন রোগের চেয়েও বমি-পাওয়া
আর সৌন্দর্যের শিকড় শুধু সাহস,
যখন ধ্বংসের পথে তোমাকে পেয়েছি এক ভালো উপহার।
এই আমাদের পরস্পরের টান।

২৫ অক্টোবর ১৯৫৮

একটি রূপকথা

একদা রূপকথার দেশে
ঘোড়সওয়ার
টগবগিয়ে মাড়িয়ে চলে
স্টেপির পাড়।

সামনে তার যুদ্ধ। দূরে
আঁধার এক অরণ্য
ঝাপসা ধুলোর পর্দা ছিঁড়ে
আসন্ন।

হৃদয়ে অস্বস্তি, বলে
আঁচড় কেটে :
'জলের ধারে শঙ্কা, নাও
কোমর এঁটে।'

শুনলে না সে। মানলে শুধু
নিজের মন,
গাছে নিবিড় পাহাড় বেয়ে
চললো ছুটে জোর কদম ;

পাহাড় পার, মস্ত মাঠ
রইলো পিছে,
শুকিয়ে-যাওয়া ঝর্নারেখার
চিহ্ন ধ'রে নামলো নিচে।

উপত্যকায় পায়ের ছাপে
জানতে
পেলো এ-পথ গেছে জলের
প্রান্তে।

সাবধানের শব্দ ওঠে
বারে-বারে ;
বধির, নিলো চালিয়ে তার
অশ্বটিকে জলের ধারে।

ঝর্না যেথায়
আঁকাবাঁকা অল্প জলে,
গুহার মুখে
গন্ধকের আগুন জ্বলে।

উগ্র লাল ধোঁয়ায় চোখ
মেঘলা হ'লো। অকস্মাৎ
অরণ্যেরে দীর্ণ ক'রে
উঠলো দূর আর্তনাদ।

চমকে ওঠে অশ্বারোহী :
'আমায় ডাকে!'

জবাব দিতে কঠিন হাতে
আঁকড়ে ধরে বর্শাটাকে ;

মিটমিটি চক্ষে পড়ে
এবার তার
মুণ্ড, ধড়, লম্বা ল্যাজ
জন্তুটার।

একটি মেয়ে
বন্দী হ'য়ে প'ড়ে আছে
শঙ্কময় বপুর তিন-
ফেরতা প্যাঁচে।

হাঁ থেকে লাল ফুলকি ওড়ে
দুলছে গলা,
যেন মেয়ের কাঁধের উপর
চাবুক তোলা।

রূপসীকে, রাজ্যে এক
নিয়ম আছে,
বলি দিতে হবে বিকট
আরণ্যক পশুর কাছে।

প্রজারা এই অর্ঘ্য দেয়
অজগরে,
বিনিময়ে দখল রাখে
বস্তিঘরে।

অবাধ সাপ বন্য সাধ
মিটিয়ে নিতে
রূপবতীর কণ্ঠ, বাহু
বাঁধে কঠিন কুণ্ডলীতে।

অশ্বারোহী প্রার্থনায়
পাঠালে চোখ ঊর্ধ্বে ;

বর্শা উঁচু করো এবার
যুদ্ধে।

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

রক্তমাখা ; লোহার টুপি
লুটোয় দূরে ;
থেঁৎলে যায় সর্প, তার
ঘোড়ার খুরে।

ছড়িয়ে আছে বর্শা আর
অশ্ব, নাগ, বালুর 'পরে ;
মূর্ছিত সে ; সংজ্ঞাহীন
কন্যা প'ড়ে।

স্নিগ্ধ নীল ঝামরে নামে,
দুপুর ভ'রে গুনগুনানি।
এই মেয়ে কে? কিষানী। রাজ-
কন্যা? রানী?

কখনো ঘোর পুলকে নামে
বিরামহীন অশ্রুধারা,
কখনো তারা মরণঘুমে
আত্মাহারা।

কখনো তার স্বাস্থ্য ফেরে,
তাকায় চোখ একবার ;
কখনো ফের রক্তপাতে
নিঃসাড়।

কিন্তু হৃৎপিণ্ড বাজে।
কন্যা, বীর, জাগবে ব'লে

বারেক কেঁপে, নিদ্রাবেশে
আবার ঢলে।

রুদ্ধ চোখ।
পাহাড়। মেঘ। জলের স্বর।
পাথর। নদী।
বছর। যুগ। যুগান্তর।

২২-২৪ অক্টোবর ১৯৫৮

অগস্ট

ঠিক তার প্রতিশ্রুতি-মতো
পরদার ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো ঘরে এলো,
বাঁকা একটি জাফরান-রঙের রেখা
ঠেকলো এসে সোফায়।

সূর্যের উত্তপ্ত হলুদে
ছেয়ে গেলো পাশের বন, পাড়াগাঁর বাড়ি,
আমার বিছানা, ভেজা বালিশ,
বইয়ের শেলফের পিছনে দেয়াল।

মনে পড়ছে বালিশ কেন ভেজা।
স্বপ্নে দেখলুম তোমরা আসছো,
একের পর এক, বনের মধ্য দিয়ে,
বিদায় দিতে আমাকে।

শিথিল ভিড় ক'রে হাঁটছিলে তোমরা।
কিন্তু একজনের মনে পড়লো
যে পুরোনো পাঁজির মতে
আজ, ছউই অগস্ট, খ্রিষ্টের রূপান্তরের দিন।

সাধারণত, এই তিথিতে, এক দহনহীন দীপ্তি
টাবর-গিরির চুড়ো থেকে ছড়িয়ে পড়ে,
আর হেমন্ত, কোনো চিহ্নের মতো স্পষ্ট,
সব দৃষ্টি নিজের দিকে টেনে নেয়।

তোমরা চলছিলে ছোটো, কম্পমান,
ভিখিরি-নগ্ন অন্ডার-ঝোপের মধ্য দিয়ে,
চলছিলে কবরখানার দিকে, যেখানে আদার মতো লালচে গাছপালা
মধুতে তৈরি পিঠের মতো জ্বলজ্বল করছে।

গাছগুলির শব্দহীন উঁচুতে
আকাশ তাদের মহান প্রতিবেশী ;
আর, মোরগের লম্বা টানা কণ্ঠনাদে
দূর ডাক দিয়ে যায় দূরতরকে।

গাছগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে কবরখানা মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে
সরকারি গোমস্তার মতো মত্যু
আমার মৃত মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে
মেপে নিলে—কতো বড়ো কবর চাই আমার জন্য।

স্পষ্ট শুনতে পেলে সবাই
কাছাকাছি, মৃদু একটি গলা ;—
ওটা আমার অতীত স্বর, প্রবক্তার,
ধ্বংস তখনো স্পর্শ করেনি তাকে :

'বিদায়, ঐ রূপান্তরের
নীল আর সোনালি ;
নারীর একটি অন্তিম আদরে কোমল ক'রে তোলে।
আমার মরণলগ্নের সব তিক্ততা।

'বিদায়, আমার কালোত্তর আয়ুষ্কাল,
বিদায়, নারী, যে-তুমি যুদ্ধে আহ্বান করেছিলে
অবমাননার পাতালকে।
আমি—আমি তোমার যুদ্ধক্ষেত্র।

'বিদায় আমার উন্মুক্ত পাখার বিস্তারকে,
উড়ে চলার স্বাধীন প্রতিজ্ঞাকে বিদায়!
বিদায়, সৃষ্টিশীলতা, অলৌকিক শক্তি,
বাণীর মধ্যে উন্মোচিত বিশ্বরূপ।'

২৮ এপ্রিল ১৯৬০

শীতের রাত্রি

তুষার ছেয়ে দেয় পৃথিবী
সকল সীমা তার ছেয়ে দেয়;
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি,
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে গ্রীষ্মে
আলোর দিকে ছোটে কীটেরা,
তেমনি জানলায় নিবিড় ভিড়ে
জমছে তুষারের পাপড়ি।

হাওয়ার তাড়া খেয়ে আঁকছে
বৃত্ত, তীর ওরা জানালায়।
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

আলোর উদ্ভাস সীলিঙে;
পরস্পরে সংবিদ্ধ—
হস্ত, পদতল সেখানে ছায়া ফেলে,
এবং নিয়তির দ্বন্দ্ব।

শব্দ ক'রে দুটো জুতো
চমকে প'ড়ে যায় মেঝেতে।
মোমের ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ে
রাতের বাতি থেকে ঘাঘরায়।

ধবলকেশ ঐ ধবল তুষারের
আঁধারে সব গেলো হারিয়ে।
টেবিলে জ্ব'লে যায় মোমের বাতি,
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

হঠাৎ কোণ থেকে ঝাপট হাওয়া
ফুঁ দিলো বাতিটার আগুনে ;
তপ্ত প্রলোভন জাগলো দেবদূত,
পাখার ধৃত ক্রুশচিহ্ন।

ফেব্রুয়ারি ভ'রে বিরতিহীন
তুষার পৃথিবীকে ছেয়ে দেয়,
টেবিলে মাঝে-মাঝে মোমের বাতি জ্বলে
টেবিলে জ্ব'লে যায়।

৩১ মার্চ ১৯৬০

বিচ্ছেদ

চৌকাঠ থেকে সে উঁকি দিলে ভিতরে,
চিনতে পারলে না নিজের বাড়ি।
সেই মেয়েটির বিদায় ছিলো উড়ে যাওয়ার মতো।
চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন ছড়ানো।

সব ঘর লণ্ডভণ্ড ;
চোখের জল আর মাথা ধরায় মিলে
তাকে দেখতে দেয় না
নিজের সর্বনাশের পরিমাণ।

সকাল থেকে একটা গর্জন চলেছে তার কানের মধ্যে।
জেগে আছে? না, স্বপ্ন দেখছে?
কেন বার-বার সমুদ্র
ঠেলে চ'লে আসে তার মনের ভাবনায়?

মেয়েটি তার প্রিয় ছিলো, আপন ছিলো
অঙ্গে-অঙ্গে,
যেমন তটরেখা সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ
তরঙ্গে-তরঙ্গে।

যেমন ঝড়ের পরে
ঢেউ উঠে প্লাবিত করে বেণুবন
তেমনি তার হৃদয়ে
মগ্ন সেই নারীর প্রতিমা।

সংকটময় কালে
জীবন যখন অচিন্ত্য,
সমুদ্রের তলদেশ থেকে নিয়তির জোয়ারে
ভেসে এসেছিলো তার কাছে এই নারী।

অসংখ্য ছিলো বাধা।
কিন্তু, জোয়ারের টানে
কোনোমতে ফাঁড়া কাটিয়ে
সে তীরে এসে ঠেকেছিলো।

এখন সে চ'লে গেছে ;
হয়তো যেতে চায়নি।
এই বিচ্ছেদ গ্রাস ক'রে নেবে তাদের,
কষ্ট কুরে-কুরে খাবে, হাড়গোড়সুদ্ধ।

লোকটি তাকালো তার চারদিকে।
যাবার মুখে
সব উল্টে-পাল্টে দিয়েছিলো সে,
দেরাজ টেনে ছুঁড়ে ফেলেছিলো সব।

সন্ধ্যা অবধি ঘুরে-ঘুরে
দেরাজগুলোয় তুলে রাখে
ছিটিয়ে-পড়া কাটা কাপড়
আর ছিটের নকশা,

তারপর, এক টুকরো শেলাইয়ে বেঁধা ছুঁচ
তার আঙুলে যখন ফুটে গেলো,
হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে
নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

২৫ অক্টোবর ১৯৫৮

মিলন

যখন ভারি হ'য়ে তুষার পড়ে ছাতের উপর
আর রাস্তাগুলিকে ঢেকে দেয়,
আমি বেরিয়ে পড়ি পা দুটোকে টান করতে, আর তোমাকে
একবার দেখবো ব'লে।

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আছো, একা,
গায়ে পাৎলা কোট, টুপি নেই, রবারের জুতোটাও নেই,
চিবোচ্ছো এক মুঠো তুষার
শান্ত হবার চেষ্টায়।

গাছগুলি, বেড়াগুলি
মিলিয়ে যায় অন্ধকার দূরে।
বরফের বৃষ্টির মধ্যে, একা,
তুমি এক কোণে দাঁড়িয়ে আছো।

মাথার রুমাল থেকে জল নেমে আসে,
চুঁইয়ে পড়ে জামার হাতায়,
চিকচিক করে তোমার চুলে
শিশিরের মতো।

একটি উজ্জ্বল অলকে
আলো হ'য়ে ওঠে
তোমার মুখ, মাথার রুমাল,
তোমার ছেঁড়া কোট আর তোমার দেহের গড়ন।

চোখের পলক বরফে ভিজে গেলো,
আছে দুঃখ তোমার দৃষ্টিতে।
অ্যাসিডে ডোবানো ছেনিতে
তুমি আছো আমার হৃদয়ে খোদিত।

আর তোমার মুখশ্রীর অদ্ভুত বিনয়
রইবে আমার হৃদয়ে চিরকাল,
এই পৃথিবীর হৃদয়হীনতায়
আর আমার এসে যায় না।

আর এইজন্যেই তুষারময় রাত্রি
মিলিয়ে দিলো নিজের দুই প্রান্ত,
তোমার আর আমার মধ্যে সীমান্তরেখা
আমি টানতে পারি না।

কিন্তু আমরা কে? কোথা থেকে এলাম?
—দেখছো না, এই সব বছরগুলির
বাকি আছে শুধু বাজে গুজব,
আর আমরা এই পৃথিবীর কোনোখানেই নেই।

২৫ অক্টোবর ১৯৫৮

ক্রিসমাসের তারা

কনকনে শীত।
হাওয়া দিচ্ছে স্টেপির দিক থেকে।
পাহাড়ের গায়ে, গুহার মধ্যে,
নবজাতক, তুমি কি শীতে কাতর?

তাঁকে উষ্ণ রাখছে ষাঁড়ের নিশ্বাস।
ঐ গুহাতেই
পোষা প্রাণীগুলোর গোয়াল;
তাই কেমন ভাপ ঝুলে আছে জাবভাণ্ডটির উপর।

তোশকের ঘাসের কুচি, খড়ের বিচি
গায়ের মেষচর্ম থেকে ঝেড়ে ফেলে
আধো ঘুমের মধ্যে, শিলাখণ্ডের প্রান্ত থেকে,
মাঝরাতের দূরত্বের দিকে রাখালেরা তাকিয়ে রইলো।

বহু দূরে বেড়া, কবরখানা, মৃতের সমাধিস্তম্ভ,
তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তর ;
বরফের মধ্যে একটা গাড়ির জোয়াল আছে প'ড়ে,
আর কবরখানার উপরকার আকাশ তারায়-তারায় আচ্ছন্ন।

কখনো, কখনো তাকে দেখা যায়নি এর আগে—
পাহারাওলার কুঁড়েঘরের জানলায়
আলোর আভাসটিও লাজুক নয় এর মতো ;—
সেই তারাটি বেথলেহেমের পথ দেখিয়ে চললো।

আকাশ থেকে, ঈশ্বর থেকে
এর পাশে স'রে দাঁড়িয়ে,
খড়ের আঁটির মতো জ্বলতে লাগলো তারাটি,
আগুন-লাগা বাগিচার মতো উজ্জ্বল।

উঠলো উঁচুতে
বিচালির স্তূপ থেকে দপদপে শিখার মতো ;
ঐ নতুন তারা দেখতে পেয়ে
বিশ্ব হ'লো চকিত।

তার আভা রক্তিম,
একটি সংকেত যেন , ঐ অপূর্ব আলোর আহ্বানে
ব্যস্ত হ'য়ে এগিয়ে এলেন
তিন জ্যোতির্বিদ।

বোঝাই-করা উপঢৌকন পিঠে নিয়ে
উটেরা তাদের পিছু-পিছু চললো ;
পাহাড়ের ঢালু বেয়ে
গাড়ি টেনে নিলে দুটো গাধা, একটা অন্যটার চেয়ে ছোটো।

দূরে ভেসে উঠলো সমস্ত অনাগত কাল
এক আশ্চর্য স্বপ্নাবিষ্ট মুহূর্তে :
সব আশা, ভাবনা, জগতের পর জগৎ, শতাব্দীর পর শতাব্দী,
ভাবীকালের সব চিত্রশালা, কলাভবন,
সব ভোজবাজি, জাদুকরের কীর্তি, পিশাচের লম্ফঝম্প,
সব ক্রিসমাস-গাছ, স্বপ্ন ছেলেবেলার :

মোমবাতির দ্যুতি, রঙিন কাগজে তৈরি শেকল
ঝলমলে রাংতার উজ্জ্বলতা...
...আরো রেগে উঠলো স্টেপির হাওয়া, দুষমনের মতো ব'য়ে গেলো..
...সব আপেল, সব সোনালি বুদ্বুদ।

পুকুরটার এক দিক ঢাকা পড়েছে অল্ডার-ঝোপে ;
কিন্তু যেখানে রাখালেরা দাঁড়িয়ে
সেখানে থেকে একটা অংশ যাচ্ছে দেখা,
দাঁড়কাকের বাসা আর গাছগুলোর উঁচু মাথার ফাঁকে-ফাঁকে।

মেষচর্মে গা ঢেকে নিয়ে তার বললে,
'চলো আমরাও যাই ওদের সঙ্গে,
প্রণত হই এই অলৌকিকের সামনে।'

বরফ ভেঙে চলতে-চলতে তারা গরম হ'য়ে উঠলো।
সেই উদ্ভাসিত প্রান্তরের উপর, কুটিরটিকে ঘিরে-ঘিরে
দেখা দিলো খোলা পায়ের ছাপ, কাচের মতো ঝকঝকে।
তারার আলোয় চেঁচিয়ে উঠলো পাহারাদার কুকুরের পাল।
যেন ঐ পায়ের ছাপগুলো মোমবাতির টুকরোর মতো জ্বলন্ত।

তুহিন রাত্রিটি যেন রূপকথা।
বরফের পাড়ি থেকে, সেই ভিড়ের মধ্যে
অদৃশ্য কারা যেন নেমে-নেমে আসে।
কুকুরগুলো পিছু নেয়, ত্রস্তে তাকায় চারদিকে,
গা ঘেঁষে থাকে সবচেয়ে ছোকরা রাখালটির, যেন কোনো
বিপদের আশঙ্কা ক'রে।

সেই একই পল্লীতে, একই পথ ধ'রে
কয়েকটি দেবদূত ভিড়ের মধ্যে হেঁটে চললেন :

দেহ নেই তাঁদের, কেউ দেখতে পেলে না,
শুধু পায়ের চিহ্ন র'য়ে গেলো।

ভিড় জমলো দরজার ধারে পাথরটির সামনে।
ভোর হ'য়ে আসে। কেদারগাছের ডালগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায়।
মারিয়া শুধোলেন, 'কে তোমরা?'
'আমরা একদল রাখাল, আর স্বর্গের দূত।
তোমাদের দু-জনকেই স্তুতি করতে এসেছি।'
'সবাইকে ধরবে না ঘরে। দরজার ধারে দাঁড়াও একটু।'

ভোরের আগে সেই ছাইরঙা প্রদোষে
কাঠের জলপাত্রের পাশে দাঁড়িয়ে
রাখাল আর গোষ্ঠপালেরা পা ঠুকতে লাগলো মাটিতে।
যারা এসেছে পায়ে হেঁটে, আর যারা ঘোড়ায় চ'ড়ে, তারা
পরস্পরকে গাল পাড়তে লাগলো,
উটগুলো উঠলো গর্জে, গাধারা পা ছুঁড়ছে জোরে।

ভোর হ'য়ে আসে। আকাশ থেকে, কয়লার টুকরোর মতো,
শেষ ক-টা তারাকে ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেলো দিন।
অতো বড়ো জনতার মধ্য থেকে শুধু ঐ তিন জ্ঞানীকে
পাথরের ফাটলের পথে মারিয়া ঘরে নিয়ে এলেন।

তিনি ঘুমিয়ে আছেন কাঠের জাবভাণ্ডে,
গাছের গর্তে জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল।
মেষচর্মের আচ্ছাদন নেই—
তাঁকে উষ্ণ রাখছে গাধার ওষ্ঠ, ষাঁড়ের নাসারন্ধ্র।

তিন জ্ঞানী আবছায়ায় দাঁড়িয়ে
ফিশফিশ করলেন, কথা খুঁজে পান না সহজে।
আর হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটি হাত বেরিয়ে এসে
তাঁদের একজনকে জাবভাণ্ডের বাঁ দিকে ঠেলে দিলে।
ফিরে তাকালেন তিনি। দরজার ধার থেকে, পুণ্যকুমারীর দিকে অনিমেষ,
অতিথির মতো,
ক্রিসমাসের তারাটি আছে তাকিয়ে।

২৯ এপ্রিল ১৯৬০

প্রত্যূষ

আমার নিয়তির সর্বস্ব ছিলে তুমি।
তারপর এলো যুদ্ধ, সর্বনাশ।
অনেক, অনেক দিন হ'য়ে গেলো।
কোনো চিহ্ন নেই, খবর নেই তোমার।

এতকাল পরে
আবার তোমার কণ্ঠস্বরে আমি চঞ্চল।
সারা রাত ধ'রে পড়েছি আমি তোমাকে।
এ যেন এক মূর্ছা থেকে জেগে ওঠা।

লোকজনের সংসর্গ চাই আমি,
যেতে চাই ভিড়ের মধ্যে, সকালের ব্যস্ততায়।
মনে হয়, টুকরো ক'রে ভেঙে দিতে পারি সব-কিছু,
পারি ওদের ক্ষমা চাওয়াতে।

দৌড়ে নামি সিঁড়ি দিয়ে
এই যেন প্রথম
বেরোচ্ছি তুষারে ঢাকা রাস্তায়
যার দুই দিকে ফুটপাত জনশূন্য।

চারদিকে আলো, গার্হস্থ্য, লোকেরা উঠে পড়ছে,
চা খাচ্ছে, ছুটছে ট্র্যাম ধরতে।
কয়েকটি মিনিটের ব্যবধানে
শহরকে আর চেনা যায় না।

ফটকে ঘন হ'য়ে তুষার জমলো
আর তার উপর ব্লিজার্ড বুনে চলেছে জাল।
ওদের সবারই তাড়াহুড়ো সময়মতো পৌঁছবে ব'লে,
অর্ধেক খাবার রইলো প'ড়ে, চা শেষ হ'লো না।

ওদের প্রত্যেকের জন্য আমরা দরদ
যেন ওদের চামড়া আমারও,

গলমান বরফের সঙ্গে আমিও গ'লে যাই,
ভোরের সঙ্গে কুঁচকে তুলি ভুরু।

আছে আমার মধ্যে নামহীন লোকেরা,
শিশুরা, কুনোরা, গাছপালা।
ওরা সবাই জয় ক'রে নিয়েছে আমাকে,
আর এই আমার একমাত্র বিজয়।

২৪ অক্টোবর ১৯৫৮

অলৌকিক ঘটনা

বেথানি থেকে জেরুসালেমে চলেছেন তিনি
বিষাদে আর আশঙ্কায় অবসন্ন।
পাহাড়ের গায়ে-গায়ে চোরকাঁটাগুলো ঝলসে যাচ্ছে রোদ্দুরে,
কাছাকাছি কোনো কুটির থেকে ধোঁয়া উঠছে না,
বাতাস তাপিত, বাঁশবন নিস্পন্দ,
আর নিস্পন্দ লবণসিন্ধুর নিশ্চলতা।

সমুদ্রের তিক্ততার সঙ্গে
তাঁর আর্তির যেন প্রতিযোগিতা ;
হেঁটে চলেছেন তিনি ; ছোটো একদল মেঘ মাত্র তাঁর অনুচর :
পথের ধুলো এগিয়ে চলে শহরের দিকে,
সেখানে, কোনো এক সরাইখানায়, শিষ্যদের সঙ্গে দেখা হবে।

চিন্তার এমন গভীরে তিনি তলিয়ে গেলেন।
যে বিমর্ষ মাঠ থেকে চিরতার গন্ধ বেরোতে লাগলো।
সব স্তব্ধ, মধ্যিখানে তিনি দাঁড়িয়ে একা।
জ্বোরো প্রান্তর চাদরের মতো টান হ'য়ে প'ড়ে আছে।

ঐ তাপ, মরুভূমি, গিরগিটিগুলো,
ঝর্না আর জলস্রোত—
সব যেন মিশে গেলো পরস্পরের মধ্যে।

কাছেই একটি ডুমুর গাছ দাঁড়িয়ে;
ফল ধরেনি, ডালপালা পল্লব ছাড়া কিছু নেই।
তাকে তিনি শুধোলেন : 'তোমাকে দিয়ে কোন সুখ হবে আমার?
কী সার্থকতা তোমার—থামের মতো দাঁড়িয়ে আছো ওখানে!

'আমি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, আর তুমি নিষ্ফলা,
শিলাখণ্ডের মতো সান্ত্বনাহীন তোমার সত্তা।
কী অপ্রতিভ তুমি! কী নৈরাশ্যজনক!
আর এমনি—এমনি তুমি থাকবে অনন্তকাল।'

বজ্রাহত বিদ্যুৎবাহিকার মতো
শিউরে উঠলো অভিশপ্ত তরু,
মুহূর্তে ভস্মীভূত হ'লো।

শাখা, মূল, কাণ্ড, পল্লব
যদি আর এক মুহূর্ত সময় পেতো,
তাহ'লে তাকে বাঁচাতে পারতো প্রবৃত্তির বিধান।
—কিন্তু অলৌকিক মানে অলৌকিক, তারই নাম ঈশ্বর।
যখন আমরা অন্ধকারে দিশেহারা
ঠিক সেই মুহূর্তেই তা খুঁজে বের করে আমাদের।

৩০ এপ্রিল ১৯৬০

পৃথিবী

মস্কোর বাড়িগুলোর মধ্যে
ফেটে পড়ে অবান্তরভাবে বসন্ত।
কাপড়ের আলমারির পিছনে পাখা ঝাপটায় পোকারা,
চলে গুঁড়ি মেরে গর্মিকালের টুপিগুলোর উপর।
লোমশ কোটগুলোকে ট্রাঙ্কে তুলে রাখা হ'লো।

কাঠে তৈরি দোতলা-তেতলার জানলায়
টবে ফুটলো লবঙ্গ-ফুল, দেয়াল-ফুল,

ঘরে যেন নিশ্বাস ফেলছে মস্ত খোলা হাওয়ার মাঠ,
চিলেকোঠায় ধুলোর মতো গন্ধ।

ঝাপসাচোখ জানলাগুলোর সঙ্গে
মিতালি পাতায় রাস্তা,
শাদা রাত্রি আর সূর্যাস্তকে
নদী বেঁধে দেয় অবিচ্ছেদ বন্ধনে।

শোনা যাচ্ছে বাড়ির মধ্যে গলিতে
বাইরের কথাবার্তা, ব্যস্ততা,
আর গলমান বরফের ফোঁটা-ফোঁটা জলের সঙ্গে
এপ্রিলের গল্প আর মস্করা।
মানুষের দুঃখের হাজার বার্তা জানে এপ্রিল,
বেড়ার গায়ে-গায়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে নেমে
সন্ধেবেলাটা রটিয়ে দেয় সেই কাহিনী।

খোলা হাওয়ায়, ঘরোয়া আরামে
আগুন আর অস্বস্তির মিশোল চলছে একই রকম ;
সবখানেই বাতাস যেন অস্থির।
চৌরাস্তায়, জানলার তাকে,
ফুটপাতে, কবরখানায়,
সেই একই উইলো-ডালের কঞ্চি,
একই ফুলে-ওঠা শাদা কুঁড়ির প্রাচুর্য।

তাহ'লে দিগন্তে কেন কুয়াশার কান্না?
গোবরের গন্ধ কেন ধারালো?
ঐ কাজে কি ডাক আসেনি আমার
সুদূর যাতে হতাশ হ'য়ে না পড়ে,
যাতে, শহরের সীমার বাইরে, পৃথিবীর
না মনে হয় নিজেকে, নিঃসঙ্গ?

আর তাই এই প্রথম বসন্তে
একত্র হই আমি—আমার বন্ধুরা,
আমাদের মিলন যেন এক ইষ্টিপত্র,

আর সন্ধ্যা মানেই বিদায়—
যাতে, দুঃখের ধারা গোপনে
তাপ দিতে পারে জীবনের ঠাণ্ডায়।

২৫ এপ্রিল ১৯৬০

দুঃসময়

যখন শেষ সপ্তাহে
তিনি জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন,
বজ্রনাদে জয়ধ্বনি এগিয়ে এলো,
ডাল হাতে নিয়ে ছুটলো তাঁর পিছনে জনতা।

দিনগুলি কর্কশ হ'য়ে উঠছে ক্রমশ, হানছে ত্রাস,
প্রেমে দ্রব হয় না কোনো হৃদয়,
অবজ্ঞায় কুঁচকে থাকে ভুরু ;
এবার সমাপ্তি, এবার পরিশিষ্ট।

আকাশ, যেন শিষের মতো ভারি হ'য়ে,
এলিয়ে আছে ছাদগুলোর উপর।
ফারিসীরা খুঁজে বেড়ায় প্রমাণ,
শেয়ালের মতো চাটু করছে তাঁকে।

মন্দিরের মধ্যে, তামসী শক্তি
তাঁকে তুলে দিলে উচ্ছৃঙ্খল ইতরের হাতে—বিচারের জন্য।
যেমন সোচ্ছ্বাসে তাঁর বন্দনা করেছিলো ওরা,
তেমনি এবার তাঁকে শাপান্ত করলে।

ভিড় জমলো বাইরে,
ফটকের ফাঁকে-ফাঁকে উঁকি দিতে লাগলো ;
কী হয়, তা জানবার জন্য ঠেলাঠেলি,
এই, এগিয়ে আসে ধাক্কায়, এই যায় পেছিয়ে।

ছোট্ট ফিশফিশে একটি আওয়াজ, পোকার মতো সারা পাড়ায় ঘুরছে,
নানা দিক থেকে উড়ে এলো গুজব।
তাঁর মনে পড়লো, স্বপ্নের মতো,
তাঁর শৈশব, মিশরদেশে পলায়ন।

মনে পড়লো শূন্য প্রান্তরের মধ্যে
রাজার মতো পাহাড়, আর সেই চূড়া
যেখান থেকে, শয়তান
জগতের প্রভুত্ব দেখিয়ে তাঁকে লুব্ধ করেছিলো :

আর কানায় সেই বিবাহ-ভোজ,
অলৌকিক দেখে মোহিত অতিথিরা,
আর সেই সমুদ্র, যার উপর দিয়ে কুয়াশার মধ্যে,
তিনি হেঁটে গিয়ে নৌকো ধরেছিলেন—শুকনো ডাঙার মতো
তাঁর কাছে সমুদ্র।

মনে পড়লো বস্তিতে জড়ো-হওয়া গরিবদের,
কেমন মোমবাতি হাতে ভাঁড়ারে নেমেছিলেন,
আর কেমন ক'রে, পুনরুত্থিত মানবকে উঠে দাঁড়াতে দেখে
মোমবাতিটা ভয় পেয়ে নিবে গিয়েছিলো।

৩০ এপ্রিল ১৯৬০

মারিয়া মাদলীনা

১

যখনই রাত নামে আমার প্রলোভক পাশে এসে দাঁড়ায়।
সে আমার ঋণ, আমার অতীতকে শোধ ক'রে দিচ্ছি।
ঝাঁকে-ঝাঁকে লাম্পট্যের স্মৃতি
শোষণ ক'রে নেয় আমার হৃৎপিণ্ড—
সেই যখন পুরুষের মর্জির বাঁদি ছিলুম আমি,
নির্বোধ—ঠিক ছিলো না মাথার—
যখন রাস্তাটাই আমার আশ্রয় ছিলো।

সময় নেই, শুধু কয়েক মুহূর্ত অবশিষ্ট,
তারপরেই সমাধিস্তম্ভের মৌনতা।
পৃথিবীর অন্তিম এই প্রান্তে দাঁড়িয়ে, তোমার সামনে,
আমার জীবনটাকে ভেঙে আমি উজোড় ক'রে দিলাম,
কোনো-এক মর্মরপেটিকার মতো।

আমার গুরু, আমার ত্রাতা,
কোথায় আজ থাকতো আমার অস্তিত্ব—
যদি না, আমার ছলনার জালে আটকে-যাওয়া
এক নতুন মক্কেলের মতো,
আবার টেবিলে ব'সে, রাত্রে
আমার জন্য অপেক্ষা করতো অনন্তকাল?

কিন্তু বলো আমাকে, এই আমি যখন
আমার নিঃসীম মনস্তাপে তোমার সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েছি-
যেমন গাছের সঙ্গে কলমের চারা একাত্ম—
তখন আর পাপের কী অর্থ,

কী অর্থ মৃত্যুর, নরকের, গন্ধকাগ্নির?
আর হয়তো, তোমার পা দুটি আমার কোলে তুলে নিয়ে,
যীশু, আমি ক্রমশ শিখে নিচ্ছি
কেমন ক'রে, তোমার অন্ত্যেষ্টির জন্য প্রস্তুতির সময়,
তোমার দেহটিকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নিতে-নিতে
ক্রুশকাষ্ঠের ফলকটিকে আলিঙ্গনে বাঁধতে হয়।

১ মে ১৯৬০

মারিয়া মাদলীনা

২

উৎসবের আগে বাসন্তী ধোয়া-মোছার পালা;
ভিড় থেকে দূরে স'রে গিয়ে
আমার ছোট্ট বাটি থেকে লোবান ঢেলে
তোমার পরম পুণ্যময় চরণের আমি সেবা করি।

কোথায় তোমার পাদুকা—খুঁজে পাই না।
আমার চোখের জল কিছু দেখতে দেয় না আমাকে;
আমার চুলের গুচ্ছ ঝ'রে প'ড়ে
ঘোমটার মতো ঢেকে দেয় আমার দৃষ্টি।

যীশু, তোমার পা দুটি আমার আঁচলে আছে বিন্যস্ত;
আমার চোখের জলে ধুয়ে দিয়েছি তাদের, আমার গলার মালা খুলে
নিয়েছি তাদের জড়িয়ে,
আমার খোলা চুল তোমার চরণের আবরণ।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ভাবীকাল
যেন তুমি কালের গতি রুদ্ধ করেছো।
এ-মুহূর্তে আমার ভাবীকথনে পটুত্ব
দূরদর্শিনী ডাকিনীর মতো নির্ভুল।

আগামী কাল মন্দিরের গুণ্ঠন ছিন্ন হবে,
আমরা কাছাকাছি থাকবো ছোট্ট দল বেঁধে, স্বতন্ত্র,
আমাদের পায়ের তলায় ট'লে উঠবে মাটি
হয়তো আমাকেই করুণা ক'রে।

প্রহরীর দল নতুন ব্যূহ রচনা করবে,
ফিরে যাবে অশ্বারোহীরা।
আমার মাথার উপরে ক্রুশকাষ্ঠ, ঘূর্ণিবাত্যার মতো,
ঠেলে উঠবে আকাশের দিকে।

আমি পতিত হবো ওর পায়ের তলায়,
ঠোঁট কামড়ে, মূঢ়ের মতো, নির্বাক,
ক্রুশের শেষ প্রান্তে বিস্তীর্ণ হবে তোমার বাহু—
তুমি কি আলিঙ্গন করবে সকলকেই?

কার জন্য, এই নিখিলসংসারে কার জন্য,
এমন উদার তোমার আলিঙ্গন?
কার জন্য এতো শক্তি,
এতো যন্ত্রণা?

এই নিখিলসংসারে
এতো প্রাণী কোথায়?
কোথায় এতো জীবন,
এতো পল্লী, নদী, অরণ্য?

অতিবাহিত হবে ঐ ত্রিরাত্রি ;
কিন্তু এমন শূন্যতার দিকে তারা ঠেলে দেবে আমাকে
যে সেই ভীষণ অবকাশে
আমি বেড়ে উঠবো পুনরুত্থান পর্যন্ত।

১ এপ্রিল ১৯৬০

গেথসেমানে

দূর নক্ষত্রের উদাসীন উদ্ভাসে
পথের মোড় আলো হ'য়ে আছে।
জলপাই-পাহাড়টিকে ঘিরে-ঘিরে উঠেছে পথ,
নিচে ব'য়ে চলে কেদ্রন।

প্রান্তর মিলিয়ে গেলো
ছায়াপথে।
ধূসরকেশ জলপাইগাছগুলোর চেষ্টা, যেন বাতাসের উপর দিয়ে
হেঁটে-হেঁটে দিগন্তে গিয়ে পৌঁছবে।

পথের ওপারে এক সব্জিখেত।
বেড়ার বাইরে শিষ্যদের তিনি দাঁড়াতে বললেন।
'আমৃত্যু দুঃখময় আমার আত্মা,
তোমরা থামো এখানে, আমার সঙ্গে প্রহর জাগো।'

যেন ওগুলো সব ঋণের সামগ্রী
এমনি অবাধে তিনি ত্যাগ করলেন
তাঁর নিখিলক্ষমতা, অলৌকিক পটুত্ব ;
এখন আমাদেরই মতো মরণশীল মানব তিনি।

প্রলয়ের রাজত্ব সেই রজনী,
নাস্তিময়,
সমস্ত জগৎ জনহীন হ'য়ে গেছে,
শুধু এই উদ্যান এখনো জীবনের যোগ্য।

তিনি তাকিয়ে দেখলেন, শূন্য, কালো,
অনাদ্যন্ত পাতালের দিকে।
তাঁর স্বেদে রক্ত হ'লো ক্ষরিত, যখন তাঁর পিতার কাছে
প্রার্থনা করলেন,
'এই মৃত্যুর পাত্র আমাকে উপেক্ষা করুক।'

প্রার্থনার বলে মৃত্যুযাতনাকে শমিত ক'রে
উদ্যানের দ্বার পেরিয়ে তিনি বাইরে এলেন।
সেখানে, তন্দ্রায় অভিভূত,
শিষ্যেরা স্তূপের মতো প'ড়ে আছে ঘাসের উপর।

তাদের ঘুম ভাঙালেন তিনি : 'ঈশ্বরের বরে আমার সমকালীন তোমরা,
আর তোমরা কিনা এলিয়ে আছো আরামে...
মানবপুত্রের সন্ধিক্ষণ আগত হ'লো
পাপীদের হাতে নিজেকে তিনি অর্পণ করবেন।'

বলামাত্র, কে জানে কোথা থেকে,
বেরিয়ে এলো এক ইতর ভিড়—চোর, ক্রীতদাস,
হাতে ছোরা, হাতে মশাল,
আর পুরোভাগে জুডাস, তার চুম্বনের প্রতারণা নিয়ে।

পিটার বাধা দিলেন ঘাতকদের,
তাঁর তলোয়ারে একটি কান হ'লো ছিন্ন।
শুনলেন বাণী : 'কলহের নিষ্পত্তি হয় না ইস্পাতে,
রাখো তুলে খাপের মধ্যে তোমার তলোয়ার।

'আমাকে বাঁচাবার জন্য, আমার পিতা
পারতেন না কি অক্ষৌহিণী বাহিনী পাঠাতে?
তাহ'লে কার সাধ্য আমার কেশস্পর্শ করে!
ছত্রখান হ'তো শত্রুরা, কোনো চিহ্ন থাকতো না।

'কিন্তু জীবনগ্রন্থ সেই পাতাটিতে পৌঁছলো
যেখানে আছে পুণ্যের পূর্ণতা।
সেই লিপিকে হ'তেই হবে সার্থক,
তবে তা-ই হোক। আমেন।

'বুঝে নাও, কালের যাত্রা একটি রূপকমাত্র,
পথে-পথে শতাব্দীগুলোতে আগুন ধরবে।
মহাকালের দারুণ মহিমার মন্ত্র জপ ক'রে
আমি, অপ্রতিহত, যন্ত্রণা পেরিয়ে নেমে যাবো কবরে।

'আর তৃতীয় দিনে আমার পুনরুত্থান।
নদীর স্রোতে সারি-সারি ভেলার মতো, দলবদ্ধ অসংখ্য
নৌকোর মতো,
অন্ধকার থেকে আমার দিকে ভেসে আসবে শতাব্দীগুলো,
আর আমি তাদের বিচার করবো।'

৩ এপ্রিল ১৯৬০

টীকা

কবিতার নাম

"হ্যামলেট"

স্তবক . পঙক্তি

৪ . ৪—রুশীয় প্রবাদ।

"পুণ্য সপ্তাহ"

৪ . ৩—Maundy Thursday—পুণ্য সপ্তাহের অন্তর্গত বৃহস্পতিবার।

৫ . ৪—যীশুর ক্রুশবরণকে 'passion' বা 'যাতনাভোগ' বলা হয়। এক শুক্রবারে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হন, পরবর্তী সোমবারে তাঁর পুনরুত্থান ঘটে। বাৎসরিক ঈস্টার-পরব এই ঘটনার স্মারক ব'লে সেই সপ্তাহটি 'পুণ্য'।

৮ . ১—রুশীয় গির্জেতে বেদীর অংশকে পৃথক ক'রে দিয়ে একটি অন্তরাল থাকে, তার দ্বারকে সিংহদ্বার বলা হয়।

৯ . ৫—খ্রিষ্টপ্রসাদ : communion বা eucharist। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত রুটি ও সুরা খ্রিষ্টের মাংসে ও রক্তে রূপান্তরিকত হয় ব'লে ভক্তেরা বিশ্বাস ক'রে থাকেন।

"বসন্তের বন্যা'

৬ . ৪—রুশীয় রূপকথার প্রতি উল্লেখ।

৮ . ৩—রুশীয় গৃহযুদ্ধকালীন পার্টিজান-বাহিনীর কথা বলা হচ্ছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলো চাষি ; বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে যুদ্ধ চালাতো তারা।

"জবাবদিহি"

২ . ৩— Manege Square : বিপ্লবকালে খণ্ডযুদ্ধের ঘটনাস্থল।

"অগস্ট"

৪ . ৩—জুলিয়াস সীজার প্রবর্তিত সংশোধিত পঞ্জিকা য়োরোপে বহুকাল প্রচলিত ছিলো ; কিন্তু ষোলো শতকে তাতে গুরুতর ভুল ধরা পড়ে ; তৎকালীন পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি তার সংস্কারসাধন করেন। রোমান ক্যাথলিক দেশগুলি এই নতুন গ্রেগরীয় পঞ্জিকা গ্রহণ করতে দেরি করেনি, কিন্তু ইংলণ্ডে ১৭৫২-র আগে তা স্বীকৃত হয়নি, আর রাশিয়া ও পূর্বয়োরোপের দেশগুলিতে তা প্রচলিত হয়েছে মাত্র বিশ শতকে। জুলিয়ান পাঁজিকে বলে 'পুরোনো', আর গ্রেগরীয় পাঁজিকে 'নতুন'।

৪ . ৪—যীশু একবার তাঁর শিষ্যদের সামনে ঐশীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ; একে বলে তাঁর রূপান্তর। এর ঘটনাস্থল টাবর পর্বত।

‘পৃথিবী”

২ . ১—মস্কোর অনেক বসতবাড়িতে একতলাটা পাথরে আর উপরের তলাগুলো কাঠে তৈরি হ'তো।

“দুঃসময়”

৩ . ৩—Pharisee : প্রাচীন একটি ইহুদি সম্প্রদায়ের নাম। এঁরা ধর্মের লিখিত বিধান অন্ধভাবে পালন করতেন, আর সেইজন্যই এঁদের মধ্যে অহমিকা ও শাঠ্য বেশি দেখা যেতো। আধুনিক য়োরোপীয় ভাষায় এই শব্দের এক অর্থ দাঁড়িয়েছে ‘বকধার্মিক’। “হ্যামলেট” কবিতায় যেখানে ‘ধর্মান্ধের শঠতা'র উল্লেখ আছে, সেখানেও ধর্মান্ধ মানে ফারিসী।

৮ . ১—সন্ত ইয়নের সুসমাচারে কথিত আছে, কানা নামক জনপদে এক বিবাহসভায় যীশু জলকে সুরায় পরিণত করেছিলেন।

“মারিয়া মাদলীনা”

মারিয়া নাম্নী যে-তিন নারী যীশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী, ইনি তাঁদেরই একজন। পূর্বজীবনে ইনি ছিলেন গণিকা ; যীশুর যাতনাভোগের পূর্বদিনে ইনি এঁর মর্মরপেটিকা ভেঙে সঞ্চিত মূল্যবান সামগ্রী দ্বারা যীশুকে অভিষিক্ত করেন, তাঁর চরণ ধৌত ক'রে আপন কেশগুচ্ছে তা মুছিয়ে দেন।

“গেথসেমানে”

গেথসেমানে এক উদ্যানের নাম। সেখানে যীশু তাঁর যাতনাভোগের পূর্বাভাস পেয়ে, শিষ্যদের কাছে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বার্তা শোনান। পরের দিন প্রাতঃকালেই তিনি গৃহীত ও ক্রুশবিদ্ধ

এজরা পাউণ্ড অবলম্বনে

১. এক অমরতা / An Immortality

প্রেমের গান গাও, কুঁড়েমি করো,
প্রেমের গুণ গাও, কুঁড়েমি করো,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

খুব তো ছোটা হ'লো দূরের পিছে
চোখের মাথা খেয়ে পুঁথিও লুঠ,
প্রেমের নুন খেলে ও-সব মিছে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

মনস্তাপে ফুল যায় তো ঝ'রে যাক,
আমার সুখ সে তো আমার আছে ;
প্রেমের গানে সব আবার বাঁচে,
কী হবে আর সব দিয়ে বা।

কেমনে তিব্বতে রাস্তা খুঁড়ি,
কেমনে তেহেরানে মন্ত্রী হই,
কেমনে কাবুলের তক্তে চড়ি—
কুঁড়ের গান সে তো ফুরায় না।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

২. বিষাদ-গাঁথা / Ballad for Gloom

শত্রু, সে যে শত্রু, তার এই-তো খেলা
আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায়।
আমার প্রাণ একলা শুয়ে ডাকলো কত
শিশু যেমন ঘুমের সময়,

আমার হাত খুঁজলো তাকে সমস্ত রাত-
প্রেমিক হাত সে কি ঘুমোয়।

কিন্তু শোনো, সবার উপর সত্য এই :

ডাকবে তাকে শত্রু ব'লে, শত্রু সে যে, আড়াল থেকে যুদ্ধ চালায় ;
মিলবে তার সঙ্গে যেমন রাতের হাওয়া অশ্লেষার প্রান্তে মিলায়।

প্রেমের খেলা খেলেছি কত বার,
ছুঁড়েছি পাশা সত্য ক'রে পণ,
স্বচ্ছ চোখে হেরেছি তার কাছে
ব্যথার পূজা করিনি নিবেদন।

বাকি কিছুই নেই তো আর, লাফিয়ে উঠি নগ্ন ধার,
কিন্তু শোনো, এ ছাড়া আর সত্য নেই :

যে হারে তার শত্রুতায় সমান-সমান
ফিরতি প্যাঁচে সে-ই জেতে।
বিদ্যুতের লাল আগুন ছুঁড়েও দেখি
অন্য শেষ নেই এতে :
তার কাছে যার তলোয়ারের ভাঙলো জোর
কিস্তিশেষে সে-ই জেতে।

শত্রু, সে যে শত্রু, তার এই তো খেলা, আড়াল থেকে কুটিল চাল।
যে-অভাগায় হারাতে তার অবহেলা তারই যে চাই কঠিন ঢাল।

ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

৩. আমাদের স্রোতে তুমি / Portrait D'une Femme

আমাদের স্রোতে তুমি সার্গাসোপুঞ্জের মতো এলে,
এ-কুড়ি বছর ধ'রে লণ্ডনের ঝাপট তোমাকে
দিয়ে গেলো উজ্জ্বল জাহাজ থেকে এটা-ওটা ফেলে :

পরচর্চা, টুকরো ধারণা, যত খুচরো সওদা,
মূল্যবান খুঁতে মাল, অদ্ভুত জ্ঞানের হরিতাল।
মনীষীরা খুঁজেছে তোমার সঙ্গ—অন্যের অভাবে।
তুমি দু-নম্বর, তুমি অন্য কারো পরে। দুঃখের?
না। এই তুমি বেছে নিলে, মামুলি চাওনি :
স্ত্রৈণ স্বামীর সুখ, বোকা হ'য়ে বাঁচার আরাম,
চিন্তার উৎপাত মনে বছরে একটি ক'রে কম।
না, ধৈর্য আছে। আমি দেখেছি তোমারে
কতক্ষণ ব'সে আছো যদি কিছু—কিছু ভেসে ওঠে।
এখন তুমিও দাও—রীতিমতো দরাজ মজুরি দাও।
তুমি-যে বিশেষ কেউ, আমরা তোমার কাছে এসে
নিয়ে যাই বিচিত্র মুনফা :
জালে-ধরা রত্নহার ; আনকোরা কথার চমক ;
বেকার খবর কিছু ; দু-একটা গল্প, মনে হয়
ধুতুরার বিষাক্ত চীৎকার—না কি অন্য কিছু?—
কাজে লাগতেও পারে, দেখা যাক। লাগে না,
কিছুই লাগে না কাজে, মানায় না কোণে কোনোখানে
স্থান নেই তার, নেই মুহূর্তের দাবি
সকাল-সন্ধার তাঁতে অবিরল কালের বুনোনে :
পুরোনো, আশ্চর্য কাজ, দাগ-ধরা, চটকবাহার ;
প্রতিমা, খচিত রত্ন, তিমিনাভি অদ্ভুত অঙ্গুরী—
এই-তো তোমার বিত্ত, ব'সে-ব'সে কত-না জমালে
নুনে-পচা অচেনা কাঠের টুকরো, কিছু-বা নতুন,
অন্তত চকচকে,—সব নিয়ে অচির বস্তুর ভিড়ে
তোমার সমুদ্র-পুঁজি ভ'রে আছে বিস্তীর্ণ ভাঁড়ার।
তবু এই কম্পমান আলো আর মন্থর ছায়ায়—
না! কিছুই তোমার নেই। অবিকল বিশ্বের প্রবাহে
তোমার নিজস্ব নেই, কিছু নেই।
তবু এ-ই তুমি।

ফেব্রু-মার্চ ১৯৫০

ওয়ালেস স্টিভেন্স

১. প্রণয়ী প্রাসাদ / Gallant Chateau

মন্দ হ'লো? আশা ক'রেই এসেছিলাম,
এসে দেখি সেই বিছানায় কেউ নেই।

থাকতো যদি এলোচুলের সর্বনাশ,
ঠাণ্ডা হাতের কঠিন চোখের বিরুদ্ধতাও।

থাকতো যদি খোলা পাতায় একলা আলো
একটি-দুটি হৃদয়হীন পদ্যে ফেলা।

থাকতো যদি পর্দা জুড়ে অন্ধকার
শুধু হাওয়ার অন্তহীন নির্জনতা।

হৃদয়হীন পদ্য? দুটি-চারটিকথায়
কেবল সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা যে সুর বাঁধা।

ভালোই হ'লো। সেই বিছানায় কেউ নেই,
ভব্যতার শক্ত ভাঁজে পর্দা ফেলা।

১৫. ২. ৫০

২. কেউ বুঝি বাড়ি নেই / The House Was Quiet And The World Was Calm

কেউ বুঝি বাড়ি নেই, কোনোখানে সাড়া নেই,
শুধু কার চোখে জ্বলে পাতা-খোলা বই।

রাত্রি অনেক হ'লো, চৈত্র গভীর,
পৃথিবীতে সাড়া নেই, সারা বাড়ি চুপ।

বই ছিলো, চোখ ছিলো, এক হ'লো দুই,
রাত্রি হ'লো পাতাখোলা চেতনার উচ্চারণ,

মনে-মনে উচ্চারণ যেন আর বই নেই,
ঝুঁকে-পড়া চোখ শুধু, খুলে-ধরা মন।

আরো কাছে, আরো চায়; হ'তে চায় সেই
কবি হ'তে সেও চায়, যার মন খুলে যায়,

বিছায় আকাশে যার চিন্তার শরীর ;
আজ এই রাত্রি যার চিন্তার শরীর।

তাই নেই, সাড়া নেই, সারা বাড়ি চুপ,
বই নেই, চোখ নেই, সে-ই তার মানে,

সে-ই তো সত্যের হাত মনের পাতায়।
পৃথিবীর শব্দ নেই, চুপ ক'রে আছে সব—

অন্য-কোনো মানে নেই, সেই তার মানে—
সব আছে খুলে-ধরা মনের চিন্তায়,

আছে এই রাত আর চৈত্রের আকাশ,
আছে বই, আছে কেউ, আছে কারো রাত-জাগা চোখ।

১৫. ২. ৫০

ই. ই. কামিংস

১. যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে / When god lets my body be

যখন র'বো না আর মর্ত্য ছাঁচে

আমার দু-চোখ থেকে ঝুলবে গাছে
গাছের ফুর্তিভরা ফলের চিকন

বৃন্তে দিগন্তের নারেঙ্গি রং
আমার ঠোঁটের ফাঁকে স্তম্ভিত গান

আনবে গোলাপে ফাল্গুনের উজান
কামতাপিত কুমারী তার ছোট্ট গোপন

স্তনের ফাঁকে সে-ফুল করবে রোপণ
আমার আঙুলে বেগ তুষার ফুঁড়ে

পাখির পরিশ্রমে চলবে উড়ে
উঠবে ঘাসের পথে ঢেউ সে-পাখার

যেখানে একলা হাঁটে কান্তা আমার
এদিকে সমুদ্রের রঙ্গে দ্বিগুণ

দুলবে আমার হৃৎপিণ্ড দারুণ

ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

২. হে সুন্দরী স্বতঃস্ফুট পৃথিবী / O sweet spontaneous

হে সুন্দরী
স্বতঃস্ফুট পৃথিবী কত বার
চিমড়োনো চিন্তাশীলের নোংরা ঘুণধরা
অশ্লীল
            আঙুল তোমাকে
খুঁটে
খুঁচিয়ে
চিমটি কেটে অস্থির করেছে
তোমাকে
      বিজ্ঞানের বজ্জাত বুড়ো আঙুল তোমাকে
টিপে
টিপে

খুঁজেছে তোমার
মাধুরী, কত
বার পালে-পালে পুরুৎ তোমাকে
হাড্ডিসার হাঁটুতে তুলে
চেপে
চেপে

কুস্তি ক'রে জন্মাতে চেয়েছে তোমার গর্ভে
দেবতা

তুমি
তোমার ছন্দে-বাঁধা
মৃত্যুদয়িতের
অপরূপ বাসরে সতী তুমি

তাদের জবাবে শুধু
বসন্তের ফুল
ফোটাও

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

উইলিয়াম কার্লস্ উইলিয়াম্‌স

জলের স্রোত থামেনি / Illegitimate Things

জলের স্রোত থামেনি—
পাখিও গায় গান

যদিও
দূর দিগন্তের

আঁচল ছিঁড়ে
প্রতিধ্বনি...

... প্রতিধ্বনি
তোলে কামান।

আবার উপত্যকা চুপ
শান্তি

যেন কবিতা
এখনো ঠিক রেখেছে তার

ভাষায় সেই
পুরোনো উন্মাদনা।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

আর্ভিড শুলেনবার্গারের কবিতা

[*অর্ভিড শুলেনবার্গার* একজন বিশিষ্ট তরুণ মার্কিন কবি ; টি. এস. এলিঅট, এজরা পাউন্ডের প্রভাব অতিক্রম করে কাব্যে একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করেছেন।]

[Chores]

কয়েকটা উকুনে চড়াইপাখি উত্তাপের আরাম পেয়েছিলো
আমাদের খোড়োচালের গোয়াল ঘরটায়
শীতের সবচেয়ে ঠান্ডা সেই দিনটিতে,
কিন্তু আমার যেহেতু শীত করছিলো, উকুনও ছিলো না মাথায়,
আমি একটু সন্দেহের চোখে দেখছিলুম ওদের,
আর দেখছিলুম
আমার আর গোরু ক-টার নিশ্বাস কেমন রোগা, ঠান্ডা হ'য়ে
মিলিয়ে যাচ্ছে তিন ফুট উঁচুতে হাওয়ায়,
গোয়ালঘরের ঝুলে-থাকা ঝিমিয়ে-পড়া হাওয়ায়।
ধূসর দিন, ধূসর গোয়াল, খড়ের গাদায় ধূসর চড়ুইগুলো,
ঠান্ডা, অস্বস্তি, জান্তব তাপ, আর হাতের কাজ,

এই সব মিলে-মিশে দৃশ্যটি ফিরে আসছে আমার মনে
এত স্পষ্ট হ'য়ে, এমন ইঙ্গিতহীন
যে আমার মনে হচ্ছে কোনো বিশ্বব্যাপী অর্থ বুঝি আছে ওর,
উঁচু, নিচু, ঠান্ডা, গরম, কৌলীন্য, কর্তব্য,
এই সব পুরোনো ধারণার উৎসে যেন ফিরে যাই।
কখনো চড়ুইপাখি হ'তে চাইনি আমি,
যার বংশাবলী ঠান্ডা আর অনেক শীতের উকুন পেরিয়ে টিকে থাকবে—
তবু আজ প্রায় যেন মনে হচ্ছে
কোনো গাণিতিক কালের হাওয়া আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাক
সেই সময়ে, যেখানে বর্তমানের শীত আর লাবণ্যই সর্বস্ব,
আর ভবিষ্যতের স্মৃতিলিপিতে এই আজকের দিন
হ'য়ে গেছে গোয়ালঘরে চড়ুইপাখির বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতা।

এই কবিতার কোনো বাংলা নামান্তর করা হয়নি বলে ইংরিজি নামটিই রক্ষিত হলো।

ডি. এইচ. লরেন্স

সাপ

একটা সাপ এসেছিলো আমার জলের জালায়
তপ্ত, উত্তপ্ত এক দিনে, গরমের জন্য আমি পাজামা প'রে—
সেখানে জল খেতে।

বিশাল, অন্ধকার ক্যারব গাছের গভীর, অদ্ভুত-সুরভি ছায়ায়
আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলুম আমার কুঁজো হাতে নিয়ে—
তারপর আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে,
কেননা জালার ধারে সে এসেছে আমার আগে।

সেই ছায়ায় সে মুখ বাড়ালো মাটির দেয়ালের একটা ফাঁক দিয়ে,
আর টেনে-টেনে নিয়ে গেলো তার পীত-পাটল শিথিলতা, পাথরের জালার
    উপর দিয়ে, কোমল জঠরে,
পাথরের উপর রাখলো তার কণ্ঠ,
আর যেখানে কল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে স্বচ্ছ সূক্ষ্মতায়,
তার ঋজু মুখ দিয়ে চুমুক দিলো,
আস্তে পান করলো তার ঋজু মাড়ি দিয়ে, তার দীর্ঘ শিথিল শরীরের ভিতরে,
নিঃশব্দে।

একজন এসেছে জলের জালায় আমার আগে,
আর আমি, দ্বিতীয় আগন্তুক, অপেক্ষমাণ।

সে তার পান থেকে মাথা তুললো, যেমন ক'রে গোরুরা তোলে,
আর তাকালো আমার দিকে অস্পষ্টভাবে, পান-রত গোরু যেমন তাকায়,
লিকলিক ক'রে উঠলো তার দ্বিখণ্ডিত জিহ্বা তার ঠোঁটের ফাঁকে, একটু সে
    ভাবলো,
তারপর নিচু হ'য়ে পান করলো আরো একটু,
সে, মৃৎ-পাটল, মৃৎ-সোনালি, পৃথিবীর জ্বলন্ত জঠর থেকে,
সিসিলির গ্রীষ্মের এই দিনে, দূরে এটনা ধূমায়মান।

আর আমার শিক্ষার স্বর আমাকে বললে,
একে মারতেই হবে,
কেননা সিসিলিতে কালো, কালো সাপে দোষ নেই, সোনালি সাপই বিষাক্ত।

আর আমার মধ্যে অনেক স্বর ব'লে উঠলো, তুমি যদি পুরুষ হ'তে
তুমি তুলে নিতে লাঠি, ওকে ভাঙতে, ওকে শেষ ক'রে দিতে।—
কিন্তু আমি কি বলতে পারি না কী ভালো ওকে আমার লেগেছিলো,
কী খুশি আমি হয়েছিলাম, ও যে এসেছিলো চুপি-চুপি অতিথির মতো,
আমার জলের জালায় পান করতে,
আর তারপর, প্রশান্ত, শান্তিময়, কৃতজ্ঞতাহীন,
পৃথিবীর জ্বলন্ত জঠরের মধ্যে চ'লে যেতে?

এ কি ভীরুতা যে তাকে মারতে আমি সাহস পেলুম না?
এ কি মনের বিকৃতি যে আমি চাইলুম তার সঙ্গে কথা বলতে?
এ কি দীনতা যে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করলুম?
এত সম্মানিত মনে হয়েছিলো নিজেকে।

আর তবু সেই সব স্বর
তুমি যদি ভয় না পেতে তুমি ওকে মারতে।

আর সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলুম, ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম,
কিন্তু তবু, তার চেয়েও বেশি সম্মানিত,
সে যে এসেছে আমার আতিথেয়তার সন্ধানে
সংগোপন পৃথিবীর অন্ধকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে।

পান ক'রে তৃপ্ত হ'লো যখন,
সে মাথা তুললো, যেন স্বপ্নের ভিতরে, মাতালের মতো,
আর ঝলসালো তার জিহ্বা, এত কালো, যেন হাওয়ার উপর দ্বিখণ্ডিত রাত্রি,
ঠোঁট চাটছে যেন,
আর চারদিকে তাকালো দেবতার মতো, দৃষ্টিহীন, তাকালো বাতাসের মধ্যে,
তারপর আস্তে মাথা ফেরালো
আর আস্তে, খুব আস্তে, তিন-গুণ স্বপ্নের মধ্যে যেন,
তার মন্থর দীর্ঘতা আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে টেনে নিয়ে যেতে আরম্ভ করলো,
উঠতে লাগলো আমার দেয়ালের ভাঙা পাড় বেয়ে।

আর সে যখন সেই ভীষণ গর্তের মধ্যে মাথা রাখলো,
আর যখন টেনে নিতে লাগলো নিজেকে, তার কাঁধ সাপ-সহজ ক'রে ঢুকলো
আরো ভিতরে,
একটা বিতৃষ্ণা, সেই কুৎসিত কালো গর্তের মধ্যে তার অপসৃতির বিরুদ্ধে একটা
প্রতিবাদ
স্বেচ্ছায় তার এই কুৎসিত কালোর মধ্যে ঢুকে যাওয়া, আর তারপর আস্তে
নিজেকে টেনে নেয়ার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ
আমাকে আচ্ছন্ন করলো, যেই সে ফেরালো তার পিঠ।

আমি ফিরে তাকালুম, রাখলুম আমার কুঁজো,
হাতের কাছে যা পেলুম, তুলে নিলুম একটা চেরা কাঠ,
ছুঁড়ে মারলুম জলের জালার দিকে ঠাশ ক'রে।
আমার মনে হয় না তার লেগেছিলো
কিন্তু হঠাৎ, তার যেটুকু বাইরে ছিলো, তা বিশ্রী দ্রুত হ'য়ে কাৎরে উঠলো,
উঠলো বিদ্যুতের মতো কিলবিলিয়ে, তারপর গেলো চ'লে
সেই কালো গর্তের মধ্যে, দেয়ালের বুকে সেই মৃৎমুখী ফাঁকটুকু দিয়ে—
আর আমি, সেই স্তব্ধ নিবিড় দুপুরে, মুগ্ধ হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুশোচনা হ'লো।
মনে হ'লো কী তুচ্ছ, কী স্থূল, কী হীন এই কাজ!
নিজের উপর এলো অবজ্ঞা, আর আমার অভিশপ্ত মানুষের-শিক্ষার উপর।
আর আমার মনে পড়লো অ্যালবাট্রসের কথা,
আর ভাবলুম সে যদি ফিরে আসতো, আমার সাপ!

কেননা তাকে আমার মনে হ'লো রাজার মতো,
নির্বাসিত রাজা, নিম্নলোকের মুকুটহীন রাজা,
এখন আবার আমরা মুকুট পরাবো তার মাথায়।

এমনি ক'রে একজনের সঙ্গে সুযোগ আমি হারালুম
জীবনের যে রাজা।
আর একটা অপরাধ রইলো আমার ক্ষালন করবার—
একটা হীনতা।

হর্বর্ট ডেভিস

কোনো ভারতীয় ভৃত্যের প্রতি

ঈষৎ-কাঁপা লম্বা বাদামি হাতে
সে নিয়ে এলো রাশি-রাশি সুখাদ্য, ঢেলে দিলে ইন্দ্রদেবের সোমরস।
খেতে-খেতে জীবনমৃত্যু নিয়ে আমাদের ফাঁপা বকুনি জমে উঠলো.
থেকে-থেকে গায়ে লাগে ঠাণ্ডা ভারতীয় হাওয়ার প্রণয়স্পর্শ।

লম্বা শাদা হাত বাড়িয়ে গৃহকর্ত্রী ঘণ্টা বাজালেন।
আহা কী তন্বী মসৃণ অঙ্গুলিকা, দামি-পালিশ-করা চোখা নখের পঞ্চ ফণা।
লাল-রং-করা—নিষ্ঠুর আলোয় যেন বিষাক্ত।
যেন আস্ত একটা যুগের সর্বনাশের আয়না।

ঘণ্টার আওয়াজ ক্ষীণ হ'তে-হ'তে যেই মিলিয়ে গেলো, অমনি এলো সে,
কর্ত্রীর ইঙ্গিতে উপস্থিত ভৃত্য। সেলাম ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।
জীবন-মৃত্যু নিয়ে তখনো চলেছে আমাদের ফাঁকা বকুনি,
থেকে-থেকে গায়ে লাগছে ঠাণ্ডা ভারতীয় হাওয়ার প্রণয়স্পর্শ।

আলোর কঠিন উজ্জ্বলতার ওপারে রাত্রির অন্ধকারের অতলতা,
তারি মধ্যে মগ্ন তার চোখ ;
তার কালো চোখের আড়ালে তার ছায়াচ্ছন্ন মনকে যেন দেখতে পেলুম,
সেখানে কোন প্রশ্ন কে জানে।

ইন্দ্রদেবের সোমরসে আমাদের মন আবিল হ'য়ে উঠলো,
পাগলের মতো বকতে-বকতে টেবিল ছেড়ে আমরা উঠলুম।
আমাদের উন্মত্ত হাসি রাত-জাগা পাখির মৃদুতান ডুবিয়ে দিয়ে
শেয়ালের চীৎকারের সঙ্গে মিশে হো-হো শব্দে উড়ে চললো আকাশের দিকে।

এদিকে তার চোখ রাত্রির অন্ধকারে মগ্ন,
কত শতাব্দীর অচেতন ইতিহাসে যেন আনত,
কালো চোখের আড়ালে তার ছায়াচ্ছন্ন মন—সেখানে কোন স্বপ্ন? কোন প্রশ্ন?

কবিতা, চৈত্র ১৩৪৯

এই কবিতাটির লেখক একজন ইংরেজ যুবক, সম্প্রতি R. A. F-এর কর্ম নিয়ে বাংলাদেশে আছেন। বলা বাহুল্য, কবিতাটি মূল ইংরেজির তর্জমা।

ভেরআরন-এর কবিতা

ভেরআরন-প্রসঙ্গে

[...এই কবির প্রথম সমাদর ঘটে--ফ্রান্সে নয়, জর্মনিতে, এবং তাঁর কোনো কোনো রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় জর্মনিতে এবং রাশিয়ায়। স্পষ্টত, জর্মন মানসের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিলো তাঁর, অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জর্মনির নিন্দায় তাঁর লেখনী মুখর হয়ে উঠেছিলো। ইএটস্ ঠিকই বলেছিলেন—যুদ্ধের সময়ে মুখ বন্ধ রাখাই কবির কাজ।]

ফ্রস্ট

সন্ধ্যা, বিশাল এক আকাশ, নির্মেঘ, নির্বস্তুক, অলৌকিক,
নক্ষত্রে তুহিন, অন্তহীন, মানুষের প্রার্থনার
অপ্রাপণীয়—আজ সন্ধ্যায় বিশাল এই আকাশ দেখা দিলো।
তার মুকুরে ধরা পড়লো দৃশ্যমান চিরন্তন।

বাঁধলো তার আলিঙ্গনে সোনায় জ্বলা রুপোয় গলা দিগন্তকে
ফোঁটা-ফোঁটা বরফ, কঠিন, আঁকড়ে ধরলো বাতাস, স্তব্ধতা, সৈকত
আর প্রান্তর—প্রান্তর অপরিমাণ। বরফের দংশনে
নীল হ'য়ে গেলো দূরত্ব. যেখানে গির্জের চুড়ো বর্শা তুলেছে উঁচুতে

শব্দহীন বন, শব্দহীন সমুদ্র, এই বিশাল আকাশ নিস্তব্ধ।
কেমন তার গতিহীন মর্মভেদী দীপ্তি!
মৌলিক এই শৃঙ্খলা, তীক্ষ্ণ দস্তিল তুষারের এই জগৎ,
আর পরিবর্তন নেই—কিছুতেই, কিছুতেই না।

অবিকল, পরম, অবর্তনীয়। মনে হয় যেন লোহা
আর ইস্পাত আমার চাতুরীহীন বেদনাময় হৃদয়টাকে নিংড়ে নিলো ;
আর আতঙ্ক তাকে বিঁধে ফেললো মৃত্যুহীন শীতে
আর কোনো ঠাণ্ডা, মহান, আকস্মিক, জ্যোতির্ময় ঈশ্বরে।

গয়লানি

গলায় বাঁধা রুমাল, ঘাগরা ঝুলছে ঢিলে,
ভোরবেলা অনেক দূর থেকে এসেছে এই ঘাসের জমিতে,
কিন্তু ঘুমের ঘোর কাটেনি এখনো, শুয়ে পড়েছে আবার
এক কোণে, গাছের তলায়, চুপচাপ।

মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লো তক্ষুনি, হাঁ খোলা, নাক ডাকছে,
তার খোলা পা আর কপাল ঘিরে গজিয়ে উঠছে ঘাস ;
বাহু দুটি হেলাফেলায় ভাঁজ করা,
হাওয়ায় ভনভন করে মাছি।

যত সব ঘাস-পোকা, কোমল তাপ আর কবোষ্ণ মাটি যারা
ভালোবাসে,
তারা বেরিয়ে এলো আস্তে-আস্তে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
জড়ো হ'লো আদরে সেই শ্যাওলার বিছানায়, যাতে ঐ
মেয়েটার দেহের তাপ ধীরে পড়ছে চুঁইয়ে।

মাঝে-মাঝে. নিজে না-জেনে, ন'ড়ে উঠছে অশোভন ভঙ্গিতে,
জাগিয়ে তুলছে তার চারদিকে মৌমাছিদের
বেশামাল হল্লা ; কিন্তু একটু পরেই, ঘুমের লোভে বিহ্বল
পাশ ফিরে তলিয়ে যায় আবার।

এই ঘাসের জমি, তার মাংসল উদ্ভিদের ভারে
যেমন ঘিরে আছে, ফ্রেমের মতো, নিদ্রাতুরাকে,
তেমনি তার শরীর যেন বলদগুলোর মন্থরতায় অলস,
চোখে জ্বলছে পশুর মতো শান্তি।

সোমত্ত মেয়ে, রক্ত তার শরীর ভ'রে সেই তেজে ফেটে পড়ছে,
যা ওকগাছের ডালগুলোকে গাঁটে-গাঁটে ফুলিয়ে তোলে :
ব্লণ্ড তার চুল, সমতলের যবের চেয়েও পাণ্ডুর,
বালুর চেয়েও হালকা।

মোটা, লাল, কর্কশ তার হাত ; তীব্র তার প্রাণরস
আগুনের ঢেউ তুলে অঙ্গে-অঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়ে

স্পন্দন তুলে বুকে, ফুলিয়ে তোলে স্তন, আস্তে তুলে ধরে,
যেমন গমের খেতে বেগ আনে বাতাস।

দুপুর, একটি সোনালি চুম্বনে, তাকে অবাক ক'রে দেয়—
আর সে এখনো ঘুমুচ্ছে, ভারি চোখে, উইলো গাছের তলায়,
এদিকে খড়কুটো ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে তার গায়ে,
মিশে যাচ্ছে চুলের মধ্যে, অবিরল।

কবিতা : বর্ষ ২০ সংখ্যা ১, ১৯৫৫

[অনুবাদকের মন্তব্যসহ এই কবিতাগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯২৭-এ, 'প্রগতি' পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে। বুদ্ধদেব বসুর বয়স তখন ১৯। সুতরাং এখানে ব্যবহৃত 'আধুনিক' বিশেষণটিকে কালের প্রেক্ষিতে স্থাপন করতে হবে—অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের "আধুনিক" ফরাসি কবিদের এখানে পাচ্ছি আমরা। ঐতিহাসিক কারণে কবির তৎকালীন বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে।—প্রকাশক]

আধুনিক ফরাসী কবিতা

(Jethro Bithell-এর ইংরাজি অনুবাদ হইতে ভাষান্তরিত)

[যে-কারণে ফরাসী কথা-সাহিত্য সৌন্দর্যে ও সৌষ্ঠবে পৃথিবীর অন্য সব দেশের কথা-সাহিত্যকে পরাজিত করেছে, ঠিক সেই কারণেই ফরাসী কাব্য-সাহিত্য pretty বড় জোর beautiful-এর আওতা ছাড়িয়ে কখনো sublime-এর পদবীতে উঠতে পারে নি। ফরাসী ভাষাটারই নাকি এমনি ছাঁচ যে তা গল্প বা উপন্যাস লেখবার পক্ষে ideal medium হ'লেও, কবিতা-টবিতা তাতে বড় জমে না, তা ছাড়া, আর-একটি কথাও আমরা সবাই জানি যে ফরাসী-মনটা synthetic নয়, analytic. এবং সেই জন্যই ওদের ভেতর ফ্লোবেয়ার-মোপাসাঁ-ব্যল্‌জাক জন্মেছে, ভবিষ্যতে আরো জন্মাবে, কিন্তু এমন একজন কবিও জন্মানো সম্ভব নয়, যা'র নাম দান্তে, মিলটন বা গোটের সঙ্গে উচ্চারিত হ'তে পারে।

সে যা-ই হোক, ফ্রাঁসোয়া ভিলঁ-র সময় থেকে আজ পর্যন্ত ফরাসী জাতি কবিতা লিখে আসছে, এবং এ-কথা কিছুতেই বলা যায় না যে এইসব কবিতা না লেখা হ'লে বিশ্ব-সাহিত্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হ'ত না। ভিক্তর হ্যুগো, লেকঁৎ দ্য লিল্ বা পল্ ভেয়ারলেইন-এর কথা ছেড়েই দিলাম—আধুনিককালেও—অর্থাৎ, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত যে-সব ফরাসী কবি দেখা দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের অন্তত মুখ চেনা থাকা ভালো। আর, আমরা কেউ যদি যত্ন করে এই নব্য কবিসম্প্রদায়ের রচনা পড়ে দেখি, তা হ'লে আজকালকার বাঙলা কবিতার সঙ্গে তা'র কতগুলো মিল সহজেই চোখে পড়বে। যাঁদের কবিতার অনুবাদ এই সংগ্রহে সন্নিবেশিত হ'ল, তাঁরা সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সকল convention অস্বীকার করেছেন: চিরাচরিত Alexandrine বর্জন ক'রে তাঁরা নূতন vers libre বা মিলহীন অসমচ্ছন্দ আবিষ্কার করেছেন ; বিস্তর বর্ণনা ও বহুল বাকযোজনার পরিবর্তে তাঁরা "intensified word" ব্যবহার করছেন। কবিতার ছন্দ যে rhythmic pose বই আর-কিছু নয়, এ-কথা প্রমাণ করবার জন্য পল ফোর (Paul Fort) গদ্যের মত করে তাঁর কবিতাগুলো লেখেন, এবং কোনো-কোনো কবিতায় মিল এমন কৌশলে লুকিয়ে রাখেন যে তাদের রীতিমত খুঁজে বার করতে হয়।

এমন পাগল কেউ নেই যে ফরাসী লেখকদের ঘাড়ে "অশ্লীলতা"-র অপবাদ

চাপাবে। আমরা যাকে অশ্লীলতা বলি, সেটা ফরাসী জাতের মজ্জাগত ধর্ম বলা যেতে পারে। মানব-মনের সমস্ত গোপন ও অ-বলনীয় প্রবৃত্তি মার্জিত ভাষা ও perfect form-এর কাপড় পরিয়ে বাইরে প্রকাশ করাই ওদের স্বভাব। ফরাসী জাতির মনের এই স্বাধীনতা অ্যাংলো-স্যাকসন জাতগুলোর প্রকাশ্য নিন্দা ও গোপন ঈর্ষার বিষয়। ভারতচন্দ্র যে-দেশে জন্মেছিলেন, সে-দেশের লোকের এ-সব জিনিষ সহ্য হওয়া উচিত, কিন্তু আজকাল বাঙলার সাহিত্য-মহলের হাওয়া যে-দিক থেকে বইছে, তা'তে বিশেষ ভরসাও হয় না। তাই কয়েকটি "স্থূল" আদিরসাত্মক কবিতা তর্জমা করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সাহস হ'ল না। কাউন্টেস মাথেউ দ্য নোয়াইল্য (Countess Mathieu de Noailles)-র কবিতাটিতে নারী-হৃদয়ের যে-আকাঙ্ক্ষা তীব্র ও অকপট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাঙলার মহিলারা তা হজম করতে পারলেই বাঁচি।

ত্রিস্তাঁ ক্লিঁগসোর (Tristan Klingsor)-এর ছোট কবিতাটিতে যে পরিচ্ছন্ন বিষাদ ফুটে উঠেছে, তা বাস্তবিক উপভোগ করবার জিনিষ। ক্লিঁগসোর ফ্রান্সের imagist movement-এর একজন পাণ্ডা। এই আন্দোলনের ছোঁয়াচ আজকাল ইংরেজি (মায় আমেরিকান) কাব্য-সাহিত্যের গায়েও লেগেছে, কিন্তু সে-কথা আলোচনা করবার জায়গা এ নয়।—অনুবাদক।

আঁদ্রে স্পিরা

নগ্নতা

তুমি মোরে কয়েছিলে : আমি তব বন্ধু হ'ব শুধু;
দেখা হ'বে, তবু তব রক্ত কভু দিব না জ্বালায়ে;
তব গৃহে দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটাইব আমরা দু'জনে
যা'দের বধিছে ওরা—সেই ভাইদের কথা ভাবি।
নিষ্ঠুর বিশ্বের মাঝে মোরা দোঁহে করিব সন্ধান
সেই দেশ—যেথায় তা'দের লাগি রয়েছে বিশ্রাম।
কিন্তু তব আঁখি-তারা জ্বলিতে দেখিব নাকো কভু,
ললাটে উত্তপ্ত শিরা স্ফীত হতে কখনো দিব না,—
আমি তব সমকক্ষ, নহি আমি সন্ধান তোমার।
চেয়ে দেখ! বস্ত্র মোর সুপবিত্র, দরিদ্রই প্রায়,
মোর কণ্ঠ-তলদেশ—তাও তুমি দেখিতে পাও না!
উত্তরে কহিনু আমি, নারী, তুমি চির-বিবসনা।
পেয়ালার মত তাজা চুলগুলি তব গ্রীবাতটে;

ঢলে-পড়া বেণীপ্রান্ত শিহরিছে স্তনচূড়া-সম ;
চুলের কাঁটারা সব ছাগপাল সম কামাতুর।...
কেটে ফেল চুল।

নারী, তুমি নগ্নতনু।
রাখিয়াছে নগ্ন হাত আমাদের খোলা পুঁথি-'পরে ;
তোমার দেহের অতি সূক্ষ্মপ্রান্ত—তব হাত দুটি।
অঙ্গুরীবিহীন তব হাত দুটি মোর হাত ছুঁয়ে গেল ব'লে।

নারী, তুমি নগ্নতনু।
সুরময় স্বর তব তব বক্ষ হ'তে উঠে আসে ;
তোমার দেহের তাপ, তোমার নিঃশ্বাস আর তব কণ্ঠস্বর,
ঝরে মোর দেহ-'পরে, মোর দেহ ভেদ করি অঙ্কুরিয়া ওঠে।
নারী, তব কণ্ঠস্বর করো উৎপাটন।

তুমি তো সে নও

তুমি তো সে নও, যা'র প্রতীক্ষায় ছিনু
চিরকাল।
তুমি তো সে নও, যা'রে দেখেছিনু আমি,
শৈশবের স্বপ্নে মোর,
আর যৌবনের।

তুমি তো সে নও, আমি খুঁজেছিনু যা'রে
পেয়ালার মতো নানা দেহের মাঝারে।
তুমি তো সে নও, যা'রে দেখেছি স্বপনে,
নামিতে পাহাড়ে-পথে—বেষ্টিত কিরণে।

যা'র যা'র পথে মোরা চলেছিনু একা,
একদিন দুই পথে হ'য়ে গেল দেখা।
বাড়ায়ে দিলাম হাত এ উহার পানে।

সেই দিন হ'য়ে গেছে ভোর,
ওগো চির-প্রিয়তমা মোর!

পরিত্যক্তা

উঠিলো সে পর্বতের 'পরে ;
আর—নগ্নদেহা,
আন্দোলিয়া সেই দেহ, যে-দেহ সে দিয়াছে ফিরায়ে,
কহিল সে :

রহ মেঘ! ওগো মেঘ, দেখ!
আর তুমি, নীল ফুল, ফুটেছ যে পদমূলে মোর,
নবীন মুকুল ওগো, ওগো লতা, লতার কুসুম,
মুমূর্ষু তুষার-রাশি আমার বুকের চেয়ে কালো,
এখনো কুমারী সবে চুম্বনের, বাসনার নয়,—
চেয়ে দেখ! চেয়ে দেখ!
যে-প্রেম চাহিয়াছিনু, তা'র যোগ্য নয় কি এ দেহ?

ফসলের ক্ষেত থেকে উঠে এলো বসন্ত-বাতাস।
হে বাতাস, কহিল সে, তুমি কেন ঘুরে সরে যাবে?
চলে যাও, আমি একা ; আর আমি শাদা।
মাতাল বাতাস যত ফুলরেণু, বীজ আর তপ্ত আলিঙ্গনে—
মিলিত দেহের গন্ধে তিতাতনু যে-সব বাতাস—
এসো সবে, নাও মোর তপ্তদেহ তোমাদের সজল নিঃশ্বাসে
ভালোবেসেছিনু বটে, এতটুকু ভালোবাসা তা'র—
তোমাদের মহাভুজ তার চেয়ে বেশি ভালোবাসি!
তোমরা আনন্দ দিলে,—তাহা মোর দুঃখের অধিক।

কাউন্টেস মাথেউ দ্য নোয়াইল্য

আমার লেখা

আমি যবে রহিব না, এই কথা যেন জানা যায়—
ভালোবেসেছিনু আমি চপলতা, চপল হাওয়ায়।
অনাগতদের কাছে কহে যেন মোর এই গীতি,
মোর কত প্রিয় ছিলো এ জীবন, সুন্দরী প্রকৃতি!

ক্ষেতের ও শহরের যত কাজ—দেখেছিনু সব,
কি যে উপহার নিয়ে আসে প্রতি ঋতুর পরব।
জল, মাটি, বহ্নি আর—সোনা ধন্য হয় যা'তে পুড়ে,
অপরূপ জেগেছিলো সব মোর মনের মুকুরে।

সাহসী সত্যেরে কভু মোর হিয়া ভয় করে নাই,
যা দেখেছি, মর্মে যাহা বাজিয়াছে, বলে গেছি তা-ই।
এমনি কঠিন প্রাণ—প্রাণে মোর জাগে এ দুরাশা,
আমি যবে চলে যাবো, তবু যেন পাই ভালোবাসা!

আমি যাহা লিখে গেনু, পড়িবে তা কোন সে যুবক—
অশান্ত অন্তরে তা'র অনুভবি দুঃসহ পুলক,
ভুলে গিয়ে তা'কে যা'রা ভালোবাসে—তা'র মুগ্ধপ্রাণ
সর্বশ্রেষ্ঠা-প্রিয়ারূপে মোরে যেন করে সে আহ্বান!

পিয়ের লিয়্যাহ্ব

ওরিয়েন্টেলিজম্

এতদিনে ক্লান্ত আমি—ভালো নাহি লাগে আর কলঙ্কিত কারা,
মলিন যৌবন মোর যেখানে সয়েছে যত ব্যথা,
জানি আমি, জানি সেই মেয়েদের মত্ত নির্লজ্জতা
পথের আলোর নীচে সার বেঁধে জড়ো হয় যা'রা।

শুকায়ে গিয়েছে রস যাহাদের স্তনযুগ থেকে,
কলপ-মাখানো চুল যাহাদের খুলে-খুলে পড়ে,
লোভনীয় আমন্ত্রণ এঁটে রাখে রঞ্জিত অধরে,
ঘৃণায় কণ্টকি ওঠে মোর দেহ তাহাদের দেখে।

যদি কভু এ উৎসব-সভা হ'তে যাই নাই ছুটে',
কামের কলুষগন্ধ যদি কভু নিয়ে থাকি, হায়,
আমার হৃদয় হ'তে খসে গেল আজ তা ঘৃণায়,
পুরাণো বালিশ যথা শয্যা হ'তে পড়ে যায় লুটে।

দূর প্রাসাদের পানে রুদ্ধশ্বাস ছোটে মনোরথ,
চাহি সেই কলাহীনা কুমারীরে কমকুন্দোপম,
সুস্বাদু চুম্বন যা'র গলে যাবে রসনায় মম,
ফটিকের বাটি থেকে পান-করা যেন সরবৎ।

কৃশ তা'র হাঁটু দু'টি। স্তনকলি বিকাশ-উন্মুখ
মোরে চেপে ধরে রেখে ভুলাইবে দুঃখের দংশন,
যুগল-হরিণ-আঁকা রুমাল করিয়া আলোড়ন
শীতল করিবে কিম্বা শ্লথ মোর বিশ্রামের সুখ।

সুগন্ধি ঘোমটা তা'র—আহা, স্নিগ্ধ, পরশকোমল!—
একটু উড়িবে ধীরে। স্নেহ তা'র আনন্দ-উর্বর
আবিষ্কার করিবে যে প্রতিদিন নূতন আদর
নির্জন বাগানে যেথা খেলা করে নির্ঝর চঞ্চল।

তবু সেই লজ্জাহীন স্বেচ্ছাচারী মোর মাঝে আছে-
নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বসি গালিচা-আসনগুলি টানি
ছুটিব হৃদয় নিয়ে সুন্দর স্বপ্নের পাছে-পাছে,
হইব উন্মনা, যবে কথা ক'বে মুখে মুখ আনি
    সুনীলকেশিনী সুলতানী!

সত্য করে' কহি

সত্য করে' কহি তোমা, তোমারে তো ভালোবাসি নাই,
তোমা-তরে নহে, হায়, হিয়ার এ হাহাকার মম।...
মলিন দীঘির জলে টলমল চন্দ্রালোক-সম
আমার নয়নে যদি স্বপ্ন মোর দীপ্ত হ'য়ে উঠে
অসহ্য আনন্দ-ভরে আবেশে পড়িতে চাহে লুটে—
ভেবো নাগো, সেই ক্ষীণ, ক্ষণিকের আনন্দ মদির
হ'তে পারে সুগভীর আভা এই এক রজনীর,
তোমারে তো নয়, আহা, তোমারে তো ভালোবাসি নাই,
    সত্য করে' কহি!

তবু আজ রাত্রে শুধু মোর প্রতি হও সকরুণা।
বড় ক্লান্ত আমি আজ।...সস্নেহে আদর করো মোরে,
তুমি নও, অন্য প্রিয়া দেখা দিক স্বপনের ঘোরে।
মধুর তোমার স্নেহ, বিষণ্ণ, বিধুর মোর প্রাণ,
চাহে সে তোমারে দিতে তুমি তা'রে যা করিলে দান,
সত্য করে' কহি!

পল ফোর

অনেক বছর পরে

আইভি-লতায় সমস্ত দেয়াল ঢেকে গেছে। আমরা ভালোবেসেছিলাম—সে ক'ঘণ্টার কথা, কয়টি অশ্রুজলের? সে কতদিন?

আর গোলাপ নেই; আইভি আঙুর-লতাকে ছিঁড়ে ফেলেছে। কোথায় তুমি?... পাখীর বাসা বেয়ে উঠে, আইভি সারা বাড়ির টুঁটি চেপে ধরেছে।

হে বাতাস! পুরোনো দিনের গোলাপে কুয়োটা ভরে গেছে। তুমি কি সেখানেই তা'কে লুকিয়েছ—আমার মৃতা প্রিয়াকে?

কেউ সাড়া দেয় না। কে-ই বা দেবে?...বাতাসের গান শোনাই কি ভালো ছিলো না—ঘাসের কানে-কানে বাতাসের গান : "হে মোর মধুরা প্রিয়া"?

সেই পুরোনো সূর্য, লাল সূর্য—সে ছাদের সমান নেমে এসেছে ;—হায় রে, মাঝখানটা তা'র কাটা!

মালীকে ডাকবো? মালীকে? বরং ঘাস ছেঁটে ফেলবার জন্য মরণকে ডাকাই ভালো।

এতগুলো স্মৃতি আর এত বেশি ভালোবাসা, আর পৃথিবীর কোলে নেমে-আসা সূর্য!

দীঘির ধারের বাঁশ

উড়ছে ফিঙে। সাঁঝের ছায়া ঐ নামিছে। উড়ছে ফিঙে, তাহার পিছে উড়তেছে বাজ।
কালো দীঘির হিম-মুখে চাঁদ ঝলমলিছে, ফিঙে যে হায় নিজকে ডোবায় ঐ ছায়া-মাঝ।

দীঘির ধারের বাঁশের কেন এমন ব্যাভার যেন তা'দের মরা-বাঁচায় যায় কি আসে?
বাজ-বধূর এ কান্না—বাঁশের জন্য না সে।—ঢেউয়ের রেখার মতো মিলায় দুঃখ এবার।

পথের শেষে

পথ হ'য়ে এলো শেষ,
সূর্য পড়িছে ঢলি,
দাও মোরে তব হাত,
তব ঠোঁট দাও মোরে।

এই মধুমাস কালো,
কপট হিয়ার মত ;
আমি পিপাসিত, দাও তব
অশ্রু করিতে পান।

ঐ হ'য়ে এল সাঁঝ!
পূজার ঘণ্টা বাজে ;
সেই প্রেম দাও মোরে
যাহে শিহরে বক্ষ তব।

নীল পাহাড়ের শেষে
শাদা ফিতাটির মতো,
পথ নেমে গেছে দূরে
এই শেষ বাঁকটিতে।

থামো গো, চাহিয়া দেখ
ঐ বনরেখা-পানে—
ঐ যে উঠিছে ধোঁয়া—
ঘুমায় সেথা একখানি গ্রাম।

আমিও ঘুমাবো সেথা,
দুয়ারের ধারে শুয়ে,
শুকনো পাতায়-ভরা
তোমার চুলের মাঝে।

কামিল্ মোক্রেয়ার্

এক মুহূর্ত

মালতী, দুয়ার খোল্! কে যেন দুয়ারে
করিছে আঘাত, শোন্, বাহিরে আঁধারে।
—পারবো না খোঁজ নিতে কেবা আসিয়াছে,
বাঁধিতেছি চুল আমি আয়নার কাছে।

মালতী, রূপসী মেয়ে—দোর খোলো, হায়,
মরিছে কে অভাজন হয়-তো সেথায়!
—এখন পারবো নাকো! কাজ আছে হাতে,
করছি সেলাই জামা রেশ্‌মি সূতাতে।

মালতী, দরজা খোল! থাকিস নে বসে,
উঠিতে পারি নে আর এ বুড়ো বয়সে।...
—বাবা, আমি পারবো না—যে আসে আসুক!
লাগাতে হ'বে যে এই জামাটায় 'হুক'!

হয়-তো সেথায় কেউ মরে পড়ে আছে,
বাতাস ফিরিছে কেঁদে দুয়ারের পাছে।
—দেখ্‌তে সে ভালো হ'লে মোরে ডাক দিতো,
কই, একটুকো মোর বুক কাঁপে নি তো!

ত্রিস্তাঁ ক্লিগ্‌সোর্

শুভ রাত্রি

প্রদীপ জ্বলিতে দাও।
দীপ্ত করে' তোলো অগ্নিশিখা
শুষ্ক বৃক্ষপত্র দিয়ে।
আর তব এলোচুল জড়াইয়া নাও,
ও মোর সোনার মেয়ে—
এই ফুলটিরে।

পেলব সন্ধ্যার মুখে
খুলে রাখো এই জানালাটি।
বাগানের যূথীগন্ধ-মেশা
লেবুর পাতার বাস—
আসিতে পারে গো যেন বিষণ্ণ বাদল-ছন্দ-সনে।

সোনার মেয়ে গো, মোরে দাও ভালোবাসিতে তোমারে-
যতক্ষণ সুমধুর উষা নাহি ফিরে আসে,
হাতে নিয়ে স্নিগ্ধ উপহার—
গোলাপী কুসুম-গুচ্ছ ছড়াতে তোমার জানালায়,
তোমার নয়নতলে যতক্ষণ দু'টি কালো রেখা
পুষ্প-সম ফুটে নাহি ওঠে॥

প্রগতি : দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯২৭

মন্তব্য

জাপানি বাদ দিলে, প্রাচ্য পাশ্চাত্য অন্য কোনো কবিতার সঙ্গে চীনে কবিতার কিছুই মেলে না। আমরা যাকে বলি বড়ো ভাব, বড়ো বিষয়, চীনে কবিতায় তা নেই, আমরা যাকে বলি গভীরতা তাও না। আবেগ, সংরাগ, আকুতি, ভক্তি, কামুকতা, এর প্রত্যেকটি বর্জন ক'রে এই কবিতা তার স্বকীয়তায় আশ্চর্য ফুটে আছে। গতানুগতিও দুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন। বিশ্বকবিতার একটি বিরাট অপাঠ্য এবং একটি উৎকৃষ্ট বড়ো অংশের যে-দুটি বিষয় অবলম্বন, সেই প্রেম আর কাম, কিংবা ঐশ্বরিক আর যৌন প্রেম, এখানে অনন্যরূপে বিরল। এ-দুয়ের সাক্ষাৎ পাই চীনে কবিতার আদিপর্বে, কিংবা দূরতর লোক-গাথায়। খ্রিঃ পূঃ ৫০০ সালেরও আগেকার নাম-না-জানা গেঁয়ো কবির একটি গীতিকা তুলে দিচ্ছি :

হাটের পথে চলতে গিয়ে
যদি তোমার আঁচল ছুঁই,
রাগ কোরো না :
সে-সব কথা কেমন ক'রে ভুলি।

হাটের পথে চলতে গিয়ে
যদি তোমার হাতেই হাত রাখি,
রাগ করবে—?
সে-সব দিন ভুলতে পারি না তো।

জন্মমৃত্যুর রহস্য বা স্রষ্টার মহিমা নিয়ে দু-একজন আদিকবি যাঁরা ভেবেছেন, তাঁদের মধ্যে চাং হং (খ্রিঃ পূঃ ১৩৯-৭৮) সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে গণিতে জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো, কিন্তু তাঁর নামে প্রচলিত কবিতা অন্য কারো লেখা। তা রচনা যাঁরই হোক, "চুয়াং জু-র অস্থি" কবিতার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

আমি এখন ইন আর ইয়াং-এ ভাসছি
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, প্রকৃতিই আমার স্বভাব,
স্রষ্টা নিজে এখন আমার বাবা, আমার মা,
আকাশ আমার বিছানা, মাটি আমার বালিশ,
বজ্র আর বিদ্যুৎ আমার ডঙ্কা আর পাখা,
সূর্য চন্দ্র আমার প্রদীপ, আমার বাতি,
আমার পাহাড়ি ঝরনা হচ্ছে মেঘ আর আকাশগঙ্গা,

আকাশের তারা আমার মণিমুক্তা।
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছি আমি।
বাসনা নেই, লিপ্সা নেই,
ধুয়ে আমাকে সাফ করতে পারবে না,
নোংরা ক'রে ময়লা করতে পারবে না আমাকে,
আমি কোথাও যাই না তবু ঠিক পৌঁছই,
ব্যস্ত নই, তবু দ্রুত।

(অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কবিতা', পৌষ ১৩৫২)

অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন এই কবির সঙ্গে তুলনীয় চাং হং-এরই সমসাময়িক ওয়াং ইয়েন-শু (আনুমানিক ৬৩০ খ্রিঃ)। এঁর "বাঁদর" কবিতার আরম্ভ :

আশ্চর্য মহান তিনি, অসম্ভব তাঁর উদ্‌ভাবন,
যিনি এই আকাশের বিস্ময় বানালেন, পৃথিবীর ইন্দ্রজাল।
অলোক সেই শক্তি, যিনি কত ক্ষুদ্রকে
কত গোপন সুন্দর ক'রে গড়লেন, সকলের মধ্যে সঞ্চরমাণ।
দ্যাখো এই বাঁদরটাকে, ধূর্ত, ছোট্ট এইটুকু,
কদাকার ; মুখটা কুঁকড়োনো যেন বয়োবৃদ্ধ,
এদিকে শরীর যেন বাচ্চা খোকার।...

এ-সব কবিতায় যে-প্রবলতা পাই, বিখ্যাত পরবর্তীদের সুপক্ক কারুকর্মে তা লুপ্তপ্রায়। এর কুললক্ষণ পৃথিবীর অন্যান্য কবিতারই অনুরূপ ; এখানে চীনে কবিতাকে মনে হয় সংস্কৃত বা লাটিন বা ইংরেজি বা বাংলা কাব্যেরই সধর্মী। কিন্তু চীন-সভ্যতার বিকাশকালে কবিতার আকাশ-যাত্রা বন্ধ হ'লো, এই উদার উচ্চারণও টিকলো না। এর কারণ অনেকে বলেন এপিক কাব্যের অভাব। চীনেদের রামায়ণ মহাভারত বা ইলিয়াড ওডিসি নেই, নাটকও দেখা দিয়েছিলো মাত্র তেরো শতকে। য়োরোপে বা ভারতে, যেখানে এপিক থেকে নাটকের এবং নাটক থেকে গীতিকার জন্ম, সেখানে গীতিকাব্য আবেগে আন্দোলিত, অলংকারে সমৃদ্ধ, নাটকীয় কথনভঙ্গিতে শতবিচিত্র। চীনেকবিতায় ও-সব গুণ কিছুই বর্তালো না, তার পরিণতি হ'লো একেবারে অন্য পথে। আট-নয় শতকে বহুবিশ্রুত তাং বংশের রাজত্বকালে তার পূর্ণপ্রস্ফুটিত স্বরূপ দেখতে পাই। দুটো লক্ষণ প্রথমেই চোখে পড়ে : বিষয়বস্তু সংকীর্ণ, অলংকার—আমাদের অভ্যস্ত অলংকার—অতিবিরল। বিষয়ের মধ্যে বন্ধুতা, বন্ধুবিচ্ছেদ, অন্যতম। বন্ধু মানে বঁধু নয়, পুরুষের পুরুষ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এর যা ব্যাখ্যা হবে তা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু কবিতার পক্ষে তা অবান্তর। তাছাড়া কবিতামাত্রেই কিছু-না-কিছু মামুলি, প্রচলিত সমাজবিধানে বাঁধা ; পারসিক সাকিও নবকিশোর—যদিও ওমর খৈয়ামের বাংলা সংস্করণে তার মেনকামূর্তির ছড়াছড়ি—শেক্সপীয়রের সনেটও অধিকাংশ এক রূপবান যুবার স্তুতিবাদ। এখানে কথাটা এই যে উপলক্ষ্য যা-ই হোক, কবিতাটা খাঁটি কিনা। পিতৃব্যবিরহে কাতর হ'য়ে কোনো বাঙালি কবির সাত পুরুষে কেউ কবিতা লেখেনি, কিন্তু লি

পো-র কবিতাটিতে আমরা উপলক্ষ্য ভুলে যাই, তাঁর দরজা বন্ধ করার শেষ দীর্ঘশ্বাসটি আমরাও ফেলি—এখানেই কবি জিতে গেলেন। চীনের উজ্জয়িনীযুগের এই রীতি, বন্ধু বিনে গীত নেই, দুঃখ মানে বন্ধুর বিদায়, বন্ধুর মুখদর্শন সুখের উদাহরণ। ব্যতিক্রমস্বরূপ এজরা পাউণ্ড রিহাকু-র (৮ম শতক) দু-একটি রত্ন উদ্ধার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের প্রসাদে ষোড়শী সওদাগর-বৌয়ের বিস্ময়কর বিরহলিপি আজ অনেক বাংলা পাঠকও পড়েছেন। মৃতা পত্নীর স্মরণে য়ুআন চন-এর খেদোক্তিও এমনি আর-একটি প্রথাচ্যুত বিস্ময়।

দ্বিতীয় বড়ো বিষয় চাকুরিজীবীর আক্ষেপ, বদলির বিড়ম্বনা, নির্বাসনের দুর্ভোগ। পুরোনো চীনা কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন 'ডেপুটিজাতীয় জীব' ; শুধু তা-ই নয়, সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্যরচনা তখন আবশ্যিক ছিলো। এতে যেমন মামুলি পদ্যে দেশ ছেয়েছিলো, তেমনি সুবিধেও ছিলো এইটুকু যে সৎ কবিকে সমাজে একঘরে হ'তে হয়নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনকরাও অনেকে ডেপুটি, তাছাড়া বর্তমান ফ্রান্সের দু-জন মুখ্য কবি, ক্লোদেল আর সাঁ-জন পের্স, রাজদূতের কর্ম করেন, কিন্তু কর্মজীবন আর কবিজীবন উভয়তই একান্ত বিচ্ছিন্ন। চীন সভ্যতার চারিত্রলক্ষণ রাজকর্মে আর কবিকর্মে পরস্পরসম্বন্ধ, যার ফলে চাকরিটাসুদ্ধু—ব্যঙ্গকবিতার না, হার্দ্য কবিতার বিষয়ীভূত। আপাতবিরোধী ও-দুয়ের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ সহযোগ অন্য কোথাও ঘটেনি ; আজ পর্যন্ত চৈনিক রাজপুরুষ সাধারণ কাব্যরসিক, এমনকি কাব্যকার—স্বয়ং মাওৎসে তুং কবিতা লেখেন।

কিন্তু বিষয় বলতে প্রকৃতিই সর্বস্ব, তাকে বাদ দিয়ে কোনো কথাই বলা যায় না। "মৃতা পত্নীকে" কবিতায় আকাশ, গাছ কি পাহাড়ের কথা একবারও নেই দেখে অবাক লাগে কেমন ক'রে চীনে কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছিলো। যেমন চিত্রকলায়, তেমনি কাব্যে, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সহবাসের চেতনা বিশিষ্ট চৈনিক ধর্ম। এর কোনো জুড়ি নেই। দেশে কালে বিচ্ছিন্ন বিসদৃশ অন্য যত কবির কথাই মনে করি, সকলের কাছেই প্রকৃতি হয় মানবজীবনের পটভূমি, নয়তো উপায়, পথ, কিংবা কোনো বৃহত্তর সত্তার বা বিশ্বসত্তার প্রতিভূ ; প্রকৃতির পিঠে চ'ড়ে অনেকেই 'অন্য কোনখানে' পৌঁছন। কিন্তু লি পো, হান ইউ বা পো চ্যু-ইর প্রকৃতিপ্রেম রাসায়নিক অর্থে বিশুদ্ধ, তাতে অন্য আকাঙ্ক্ষার মিশোল নেই। ফুল, মেঘ, হাওয়া, এমনকি জড় পাথরেও তাদের প্রণয়ের কারণ এ নয় যে তারা অমৃতের প্রতীক বা ইঙ্গিত—তারা আছে, এবং তাদের নিয়ে আমিও আছি, এই চেতনাতেই তাঁরা আত্মহারা। যদিও প্রাচ্য, এঁরা হিন্দু বা পারসিক ভক্তভাবের নামগন্ধবর্জিত, পরমাত্মায় নিঃস্পৃহ, এঁদের কথা হাফিজের বা বৈষ্ণবের বা গীতাঞ্জলির নয়। হান ইউ-র পর্বতপ্রেমে কোনো অমর্ত্য ঈপ্সা নেই, তাকে আমাদের খুব চেনা বৈরাগ্য ভাবলেও ভুল হবে। ধর্মভাবের তুলনায় সৌন্দর্যবোধ এখানে প্রধান, 'তাঁকে পাবো কি পাবো না তার চাইতে সৎজীবন বড়ো কথা। 'তাও দর্শনে'র প্রভাবে শিক্ষিত সমাজের তখন এই আদর্শ ; জ্ঞানী গুণী রাজপুরুষ সকলেই চেয়েছেন মুখর সংসার ছেড়ে দূরে, বনে, পাহাড়ে, সৈকতে, শান্ত নির্মল ভাবুকতায় দিন কাটাতে। ভাবুকতা মানে ধ্যান?

না, সুরা চাই, বন্ধু চাই, বীণা চাই। এ-ইচ্ছা শুধু ছবিতে কবিতায় নিবেদন ক'রে তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বাস্তবেও প্রয়োগ করেছেন। কবিরা রাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে (কিংবা চাকরি খুইয়ে) কতবার যে বনে গেছেন, আবার ফিরেছেন, আমাদের কাছে সে-কাহিনী কৌতুকাবহ।

আধুনিক পরিভাষায় একে বলে এস্কেপিস্ট। ওটা একটা গাল দেবার বুলি, তাই অর্থহীন। যদি বলা যায় যে কেবলই বনে যেতে চাইলে কবিতায় বাস্তববোধ ক্ষীণ হবে, আশ্চর্য এই যে এখানে ঠিক উল্টোটারই প্রমাণ পাই। চীনেরাই বিশেষভাবে বাস্তবের কবি, এমনকি সাংসারিকতার; প্রতিদিনের ঘরকন্নার এমন খুঁটিনাটি পৃথিবীর আর-কোনো গীতিকাব্যে মিলবে না। চীনেকবি নির্বস্তুকের বিরোধী, তাঁর আরাধ্য মূর্ত— যাকে বলে কংক্রীট—সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিমাপূজায় তিনি প্রতিশ্রুত। তাই তাঁর প্রকৃতিবর্ণনা একেবারেই যথার্থ, হুবহু চোখে দেখে লেখা, ঠিক যেটুকু দেখা সেটুকুই লেখা। একই কারণে উপমায় তাঁর বিরাগ, উক্তিতেও অনাস্থা। কাব্যের প্রধান উপায় ইঙ্গিত, ইঙ্গিতের উপায় ছবি। চৈনিক চোখে ছবি আর কবিতা একাত্ম; তারা ছবি লেখে, কবিতা আঁকে; তাদের বর্ণমালার অক্ষরও এক-একটি ছবি, ভাবচ্ছবি। যেমন ল্যাণ্ডস্কেপে তাদের পাতার পর পাতা কবিতার মতো প্রবাহ, কবিতায় তেমনি দৃশ্যছবির রূপায়ণ। কখনো দেখা যায় দু-চার লাইনে ছবি এঁকেই কবির তৃপ্তি, ছবির পরে কথা নেই, ছবিটাই কথা।

ভিক্টরীয় উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হ'য়ে আধুনিক পশ্চিমী মন চৈনিক চিত্রলতায় মুগ্ধ হ'লো। অপূর্ব লাগলো এই কম-ক'রে-বলা কবিতা, গলা চড়ে না, ঘোষণা নেই, কোনো কথায় জোর দেয় না, সব কথা খুলেও বলে না। মৃদু, নিস্তাপ, বিষণ্ণ, এর শক্তি সূক্ষ্মতায়, যাথার্থ্যে, অবিচল পার্থিবপ্রণয়ে। উপমার বদলে বস্তুটারই ব্যবহার, বিবৃতির বদলে চিত্রকল্পের প্রয়োগ, চীনেদের কাছে এই দুই সূত্র শিখে নিয়ে এজরা পাউণ্ড তাঁর ইমেজিস্ট আন্দোলনে কেমন কাজে লাগিয়েছিলেন সে-খবর আজ সকলেই জানেন। শুধু ছবির ইঙ্গিতে কবিতা বলার একটি চরম নমুনা পাউণ্ড পেশ করেছেন তাঁর প্রিয় কবি রিহাকু-র আর-একটি স্ত্রীপুরুষঘটিত রচনায় :

প্রবালসিঁড়ির বিলাপ

> প্রবালসিঁড়ি শিশির প'ড়ে-প'ড়ে শাদা,
> কত রাত? আমার মসলিনের মোজা শিশিরে ভিজলো,
> স্ফটিকের পরদা টেনে দিয়ে
> আমি ব'সে-ব'সে দেখি স্বচ্ছ শরৎ, শরতের চাঁদ।

'প্রবালসিঁড়ি, অতএব প্রাসাদ। বিলাপ, মানে নালিশ কিছু আছে। মসলিনের মোজা, মানে নায়িকা কোনো পুরসুন্দরী, দাসীদের কেউ না। স্বচ্ছ শরৎ, তাই নালিশের কারণ শীতগ্রীষ্ম নয়। নায়িকা অনেকক্ষণ অপেক্ষমাণা, কেননা শিশিরে শুধু সিঁড়িই শাদা হয়নি, মোজাও ভিজে গেছে।' এই ব্যাখ্যা দেবার পরে পাউণ্ড বলছেন, 'স্পষ্ট কোনো অভিযোগ নেই

ব'লেই কবিতাটি মহামূল্য।'

অনুবাদে ঠিক বোঝা যাবে না ব'লে পাউণ্ডকে টীকা জুড়তে হয়েছে, কিন্তু মূলত যদি এত অল্পেই এতটা বলা হ'য়ে থাকে তাহ'লে আশ্চর্য বইকি। (জাপানি তানকা ঠিক এই জাতের না—সেখানে কথাটাও ক্ষীণ।) অবশ্য কাব্যের তির্যকরীতি সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে ; সংস্কৃতে একে বলতো 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ধ্বনি', কিন্তু 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' এর তুলনায় বড্ড বেশি ব'লে ফেললো। আড়িতে বলতে চীনে কবির মতো নিপুণ কেউ না ; বস্তুত, অন্য কোনো ভাবে বলতেই তিনি অনভ্যস্ত। ফলত, চীনে কবিতায় বৈচিত্র্য কম, এবং কোনো-কোনো মহৎ কাব্যরূপের সম্ভাবনাই নেই ; র‍্যাঁবো-র "মাতাল তরণী", কি 'বলাকা', কি 'ফোর কোয়ার্ট্রেটস' সেখানে অচিন্ত্য। কিন্তু সেখানে যা আছে তাও অন্য কোথাও নেই ব'লে বিশ্বসভায় তার এত সম্মান, তাছাড়া এখনকার তরুণ বাঙালি কবিরা, যাঁরা নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, চীন সংসর্গে তাঁরা হয়তো সৎপরামর্শ পাবেন।

[১৯৪৯]

লি পো (৭০১-৬২)

আমার পিতৃব্য রাজগ্রন্থাগারিক ইউন-এর বিদায়-ভোজে

আহা সেই যৌবনের দিন দিয়েছি ছড়িয়ে উড়িয়ে।
কত হাসি কত গান,
বন্ধুমহলে সুশ্রী মুখের জাঁক। আজ হঠাৎ
ফুরোলো গান বুড়ো হলাম বুঝি না বুঝেও বুঝি না।
তবু ফিরে আসে বসন্ত, দেখে মন ভরে আনন্দে।
এখনই, বন্ধু, যাবে?
এসো তবে এই একটু সময় হালকা ওড়াই
সুখের হাওয়ায়। বাইরে চলো।
মুকুল ধরেছে প্লামের ডালে, ডাকছে পাখি,
আনো সুরা, আনো গান।
বিকেলের আলো পাহাড়ের পায়ে লুটোয়,
এসো আর-একটু বেড়াই।
একটু পরেই কেউ আর নেই, অন্ধকার। বাঁশের ঝাড়
কী-চুপচাপ।
রাত কত হ'লো, এবার দরজা বন্ধ করো।

১৭ জানুয়ারি ১৯৪৭

১. পাহাড়ি পথ

সরু পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠলাম,
পাথরে পা কাটলো।
থামলাম না, মন্দিরে চলেছি।
পৌঁছতে দেরি হ'লো।
সন্ধ্যা তখন, অন্ধকারে বাদুড় নড়ছে,
মণ্ডপের ঠাণ্ডায় গা জুড়োলো।
সেখানে ফুল ফুটেছে টগর, মস্ত কলাপাতা হাওয়ায় দুলছে—
আহা, বৃষ্টি-ভেজা।
ভিতরে আঁকা আছেন তথাগত, এসো দেখবে, ,
ব'লে পুরুৎঠাকুর সঙ্গে চললেন আমার,
আলো এনে তুলে ধরলেন দেয়ালে—
আশ্চর্য ছবি।
মাদুর ঝেড়ে দিলেন নিজের হাতে, আনলেন খাবার,
লাল চালের মোটা ভাত, অড়র ডাল, সন্ধভ নুন।
খিদে মিটলো।
রাত হ'লো, শুয়ে-শুয়ে একটি পোকার ডাকও আর শুনি না,
চাঁদ এলো আমার ঘরে, শান্ত, সুন্দর।...
ভোর হ'তেই বেরিয়ে পড়েছি আবার, ঘুরতে-ঘুরতে
    পথের ভুল হ'লো,
এই লুকোই, এই বেরোই, ওঠা-নামার ঘোরপ্যাঁচ
    ফুরোয় না।
এদিকে ঘন কুয়াশায়
বেগনি রং ধরলো পাহাড়ে, ছড়িয়ে গেলো সবুজ,
আকাশ থেকে ঝর্নার জলে ঝলমল।
চলেছি পাইনবন পেরিয়ে,
হঠাৎ ওকগাছের ধার ঘেঁষে—প্রকাণ্ড, দশ জোয়ান
    বেড় পায় না--
নামছি ঝর্নার খরস্রোতে কাঁকর মাড়িয়ে,
হাওয়ায় গান ওঠে ছলছল...ছলছল।
চলো,
কাপড় ভেজে ভিজুক,
মিলাক, আরো দূরে শহর,

প'ড়ে থাক পিছনে আমার আপন দেশ, আমার পুঁথিপত্র,
রাজার কাছে দরবার।
কাজ কিছু শেষ হয়নি, না-ই বা হ'লো,
আমার বাছা-বাছা তুখোড় ছাত্ররা ব'সে থাকবে—
ক-দিন আর থাকবে।
আমি বুড়ো হয়েছি, আমার এখানেই ভালো।

২. চাঁদের উৎসবে

(সব-ডেপুটি চাং-কে)

মেঘ স'রে গেলো, ছায়াপথ মিলায়,
হাওয়ার ধার ঝেঁটিয়ে নিলো আকাশ, চাঁদের ঢেউ ফুলে উঠলো,
বালি মসৃণ, জল শান্ত, শব্দ নেই, ছায়া নেই, জ্যোছনায়।
এসো বন্ধু, এই নাও সুরা, আজ তোমার গান শুনবো।
তুমি গান ধরলে—কিন্তু কেমন গান? কান্নার মতো,
আমার দু-চোখ ছাপিয়ে গেলো শুনতে-শুনতে।
 'তুং-তিং হ্রদ যেখানে আকাশে মেশে
নয়-সংশয় উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়,
যেখানে ড্র্যাগন, হাঙর উঠছে, ডুবছে,
ডাকছে বানর, কাঁদছে উড়োশেয়াল।
ধুকধুক বুকে আঁকড়ে প্রাণ
চাকরিতে আমি পৌঁছলাম,
সঙ্গহীন, শব্দহীন,
লুকিয়ে যেন পালিয়ে আছি।
বিছানা ছেড়ে উঠতে ভয়, সাপের ভয়,
খাবারে মেশা বিষের ভয়,
হ্রদের হাওয়ার রোগের বীজ,
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ তার।...
কাল শুনলেম জেলার হাকিম
রটিয়ে দিলেন ঢাক পিটিয়ে
রাজত্বের বদল হ'লো ;
সিংহাসনে নতুন এক
সম্রাটের আমল শুরু।
লম্বা ক্ষমার ইস্তাহার

ছুটছে রোজ চারশো মাইল,
মৃত্যু যাদের দণ্ড, সবাই
মুক্তি পেলো, নির্বাসিত
ফিরলো ঘরে, চুনোপুঁটির
ফিরলো কপাল, বেহুঁশ ঘুষখোরের দল
এক কলমে বাতিল—
সজ্জনের নাম উঠলো দপ্তরে।
আমার নামও পাঠিয়েছিলেন বড়ো হাকিম,
লাটসাহেব কানেও সেটা নিলেন না,
উল্টে আমায় বদলি ক'রে দিলেন এই
জংলি পচা মফস্বলে।
চাকরি আমার একেবারে নিচু ধাপের,
কী বা হবে নাম ক'রে—
কোনদিন না শুনি আমার শাস্তি হ'লো
চৌরাস্তায় পঁচিশ বেত।
আমার সঙ্গে ঘর-তাড়ানো আর যারা
ফিরছে এবার একে-একে,
সে-পথে পা ফেলার আশা
অসম্ভব স্বর্গ আমার,
অসম্ভব, অসম্ভব।'
...দোহাই, গান থামাও, আমার গান শোনো এবার,
অন্য গান, ভিন্ন সুর—আকাশের গান শুনতে পাও না?

'মাঝে-মাঝে চাঁদ যদিও আসে
এমন চাঁদ কি ফিরবে?
কে জানে আবার কবে বসন্ত
এই সৈকতে ভিড়বে।
যদি ঠেলে দাও আজকের সুরা
কাল কি ভরবে পেয়ালা,
কাঁদলে কি আর ভাগ্য ভুলবে,
চলবে সে তার খেয়ালে।'

পো চু-ই (৭৭২-৮৪৬)

১. পাহাড় চড়ার স্বপ্ন

বুক ফুলিয়ে পাহাড়ে চড়ি আমি,
বেরিয়ে পড়ি লম্বা লাঠি হাতে একলা।
হাজার চূড়া, অসংখ্য উপত্যকা,
একটি বাকি থাকলো না, সব ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।
ক্লান্তি নেই, জিরোতে হয় না একবার,
জোয়ান পা, নিশ্বাসে যৌবন।
...সব স্বপ্ন, রোজ রাত্রে এই স্বপ্ন দেখি।

কিন্তু কেমন ক'রে?
মন যখন স্মৃতির পথে পিছনে ফেরে
শরীরেও যৌবন আসে আবার?
শরীর কি মনেরই তবে ছায়া?
তাহ'লে কেন শরীর ভেঙে পাত হ'লেও মনের তেজ
ফুরোতে চায় না?

না, দুটোই মায়া।
স্বপ্ন মিথ্যে, বাস্তবও সত্য না।
দ্যাখো-না দিনে আমার থরথর ক'রে পা কাঁপে,
আবার রাত্রি ভ'রে লাফিয়ে বেড়াই পাহাড়ে।
এদিকে দিন যত, রাত্রিও ততক্ষণ,
তাই দিনে আমার যত লোকশান, রাত্রে ঠিক ততটাই
আমার লাভ।

১৮-১৯ জানুয়ারি ১৯৪৭

২. গাছ ছাঁটা

ঠিক আমার জানলাটারই সামনে দেখি
গাছের সারি উঁচু হ'লো, পল্লবে পুরন্ত ডাল,
হায় দূরের পাহাড় তাতে আড়াল—
ফাঁকে-ফাঁকে ঝিলিক দিয়েই লুকোয়।

সেদিন আমি কুড়োল নিয়ে বেরোলাম,
এক-এক কোপে এক-এক ঝোপ সাবাড়।
কত হাজার পাতা ঝরলো গায়ে মাথায়,
হাজার চূড়া হঠাৎ কাছে এলো।
মনে হ'লো মেঘের ঘোর আব্রু ছিঁড়ে
নিঃশঙ্কে মুখ দেখালো নীল,
মনে হ'লো কত যুগের পরে, বন্ধু,
আবার তোমার দেখা পেলাম।
প্রথমে মৃদু হাওয়ার ঢেউ ব'য়ে গেলো,
একে-একে পাখি ফিরলো ডালে।
মনের ভার নামাতে চাই অবাধ নৈঋতে,
চোখের তাক পাহাড়ে, মন—কোথায়।
সত্যি কথা, পক্ষপাত আছেই আছে,
বলো তো কোন ভালোয় কিছু মিশোল নেই।
কচিপাতার সবুজও ভালোবেসেছিলাম,
আরো ভালোবাসি পাহাড়, এইটুকুই দোষ।

য়ুয়ান চন (৭৭৯-৮৩৯)

মৃতা পত্নীকে

বাপের ছোটো মেয়ে, আদরিণী তুমি,
অদৃষ্টের দোষে এই গরিব পণ্ডিতের হাতে পড়লে।
আমার ছেঁড়া জামায় চোখ নামিয়ে যখন রিপু করতে,
আমি মিষ্টি কথায় তোমার মন ভিজিয়ে, আস্তে
একটি-দুটি সোনার কাঁটা খুলে নিতাম খোঁপার—
মদ কেনা চাই তো।
রাঁধতে বুনো আনাজ
পাতা গুড়িয়ে উনুন জ্বেলে।
...আজ শুনছি ওরা সভা ডাকছে, আমার লাখ টাকার ডালি নাকি তৈরি—
আজ তোমায় কী দেবো তা-ই ভাবি।
তোমার নামে মন্দিরে পুজো? এ-ই?

২

কে আগে মরবে বলো তো? আমি! না, আমি!
কত ঠাট্টা দু-জনে ব'সে করেছি।
একদিন হঠাৎ তুমি চ'লে গেলে
আমার চোখের উপর দিয়ে, তুমি।
তোমার জামাকাপড় সবই প্রায় বিলিয়ে দিলাম,
তোমার শেলাইয়ের বাক্স খুলে দেখতে সাহস হয় না।...
ঝি-চাকর সকলের দিকে তোমার হাত ছিলো দরাজ,
আমিও সেটা রেখেছি, কিন্তু তোমার মতো হয় না।
...বুদ্ধের কথা সত্য, বেঁচে থাকলে প্রিয়বিয়োগ হবেই,
কেউ নিস্তার পায় না;
তবু বলি, একসঙ্গে আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন যাদের কেটেছে,
এ-দুঃখ তাদের মতো কি আর কারো।

দুঃখ শুধু তোমার জন্য?
না, নিজের কথাও ভাবি।
সত্তর হ'তে কত আর দেরি আমার?
আমি তো ভালো-মন্দয় সাধারণ—
দেখেছি মহৎ মানুষ, কে জানে কার শাপে নিঃসন্তান।
আমি তো চলনসই পদ্য লিখি,
শুনেছি মহাকবির কথা, তাঁর ডাকেও ওপার থেকে
সাড়া দেয়নি ঘরনী।
মৃত্যুর পরে মিলন?
বিশ্বাস করি না, তুমিও কোনোদিন করোনি।
সেই অন্ধকারেই শেষ, আর আশা নেই জানি।
তবু
রাত্রি ভ'রে চোখ মেলে তাকিয়ে
আমি দেখতে পাই
তোমার মেঘলা কপালে
তোমার সমস্ত জীবনের সংসারে চালাবার
দুশ্চিন্তা।

১৯ জানুয়ারি ১৯৪৭, পরিমার্জনা ৩ মার্চ ১৯৫০

নাকামুরা কারসুতোমো

কৃপাণ-গাথা

মৃত্যু-স্বপ্ন

অতি শুভ্র সে ;—কুহেলি-শুভ্র আর হিম-সুশীতল,
এই যে হেথায় শীত-জ্যোৎস্নায় ঝুলিতেছে কঙ্কাল।
জয়-পরাজয়, দুরাশা ও ভয়, সুখ-স্বপ্নের জাল—
জীবন-কাহিনী বলা হ'লে পরে এরা শুধু মিছে ছল।

ইজ্জৎ লাগি' এই ক্ষণে মোর নিষ্কলঙ্ক অসি
অর্পিবে এই শূন্যগর্ভ দেহ মৃত্যুর পাশ,
তবু যবে মোর বক্ষেতে আর র'বে নাকো নিঃশ্বাস,
রক্ত-বরম মোর হৃদয়ের নিষ্ঠা জাগিয়া র'বে
প্রভুর শিয়রে প্রহরীর মত বসি'।

আজুমি রিয়োসাই

বৃদ্ধ পরীক্ষক

স্বচ্ছ সুমিদা নদী কূলে কূলে ফোটে চেরী ফুল, জানি,
তরু-শাখে-ফোটা মঞ্জরী চেয়ে সুন্দরী নারীগণও
কাজল-চোখের মেঘেতে উজল হাসির বিজলী হানি'
সার বেঁধে চলে ; সারবান্ এক উপদেশ এবে শোনো।
আমি বলি তোমা—ওই অঞ্চলে যেয়ো না কখনো ভুলে
চেরী-ফুলরাশি ফুটে রহে যবে নীল সুমিদার কূলে।

শরৎ-নিশিতে শোভে যবে শশী গর্ব্বদীপ্তরুচি,
তটিনীর বুকে ছোট ঢেউগুলি সোনায় বদল করি',—
জ্যোছনারও চেয়ে শুভ্র এবং তুষারেরও চেয়ে শুচি
একটি মেয়ের সুন্দর মুখ ঝলসিবে আঁধার ভরি ;

আমি বলি তোমা, পুঁথি লয়ে বসো নীরবে ঘরের কোণে,
জ্যোছনা-উজল নদীতটভূমে ভ্রমিয়ো না আনমনে।

সেকালের সব মুনিঋষিগণ বহু সাধনার ফলে
লভিয়াছিলেন জ্ঞানযশভার সারাটি জীবন ভরি'।
তুমি কি ভেবেছ চাঁদের আলোর, ফুল-মঞ্জরীদলে
হেরিবার তব আছে অবসর? নহে, যেই পথ ধরি'
গিয়েছেন তারা, সে কঠিন পথে তোমাকে ভ্রমিতে হ'বে,
সেই অনুরূপ ফল-লাভ তরে মনে যদি আশা র'বে।

তিরিশ বছর ধরি' মোর এই নিষ্প্রভ আঁখি দুটি
ছাত্র দলের রচনা দেখেছে ;—লক্ষ্য করেছে ভালো,
কে চলেছে পথে বীর-বিক্রমে, কে-ই বা পড়েছে লুটি',
কোথায় শ্রেষ্ঠ বিভায় জ্বলিয়া উঠেছে জ্ঞানের আলো।
দেখেছে বাসনা ক্ষমতা চেষ্টা—কত জীবনের ধারা
নষ্ট হইতে জ্যোছনায় চেরী-কুসুমেতে হ'তে সারা!

'কল্লোল'/৫ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা/জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

খলিল জিব্রান

অন্ধ কবি

অন্ধ মোরে করেচে আলোক।
যে-সূর্য্য দিয়েছে তোমা দিবস তোমার,
স্বপ্নাধিক সুগভীর রাত্রি মোর দিয়েচে আমায়।

তবু আমি পথের পথিক,
তুমি র'বে বসে' যেথা জন্ম তোমা দিয়েচে জীবন
যতক্ষণ মৃত্যু নাহি আছে তোমা নবজন্ম দিতে।

তবু আমি খুঁজি' লব পথ,
সঙ্গে মোর যষ্টি আর বীণা
তুমি যবে ব'সে-ব'সে মন্ত্রজপ করিবে তোমার।

তবু আমি বাহিরিব অন্ধকারে
তুমি যবে আলোকেরো ত্রাসে সঙ্কুচিত।
আর আমি গাহিব সঙ্গীত।

হারাতে পারি নে আমি পথ।
সবিতাও রহে নাকো যবে
আমাদের যাত্রাপথ বিধাতা করেন নিরীক্ষণ,
তাই মোরা রহি নিরাপদ।

যদিও চরণ মম ক্ষণে-ক্ষণে দাঁড়াবে থমকি'
বায়ুভরে পক্ষ মেলি' গান মোর চলিবে বহিয়া।

সুগভীর সুমহান-পানে
চাহিতে চাহিতে অন্ধ হ'য়ে গেচি আমি।
গভীর মহান-পানে ক্ষণিকের দৃষ্টিপাত তরে
কে বা তার চক্ষু দুটি দিবে নাকো দান?

দুটি ক্ষুদ্র কম্পমান দীপ কেবা ফুৎকারেতে দিবে না নিবায়ে
হেরিবারে লেশমাত্র আভাস উষার?

তুমি বলো, "আহা, ও যে দেখিতে পারে না তারারাজি
দেখিতে পারে না ক্ষেত্র, দেখিতে পারে না শেফালিকা।"
আমি বলি, "আহা, ওরা যেতে নাহি পারে তারালোকে
শুনিতে পারে না ওরা শেফালির বাণী।
ওদের নাহিকো, আহা, কর্ণ মধ্যে অন্য কোনো কান।
আহা—আহা—উহাদের নাহি ওষ্ঠাধর
প্রতি অঙ্গুলির বৃন্ত 'পর।"

আরব কবি Kahlil Gibran-এর ইংরেজী কবিতা "The Blind Poet"-এর অনুবাদ।
'কল্লোল'/৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা/ফাল্গুন, ১৩৩২।